লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ভাদ্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ■ ১৬ শাবান, ১৪২৮ হিজরি
৩১ আগস্ট, ২০০৭ ঈসাব্দ

খিলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮ লগো

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

সংযমী হতে – শুদ্ধতা দান করতে আর পরিত্রাণ পেতে আবারও আসছে মাহে রমযান

আত্ম সংযম ও আত্মশুদ্ধি আর আত্মার পবিত্রতা অর্জনের ... নাজাত লাভ করার শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে পবিত্র মাস মাহে রমযান আমাদের দ্বার প্রান্তে প্রায় সমাগত। এ ছাড়াও এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দার দোয়া অধিক কবুল করে থাকেন।

পবিত্র কুরআন করীমে রোযা পালনের নির্দেশের সাথে সাথে এর কল্যাণ ও আশিসের বিষয়ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে (সূরা বাকারা আয়াত নং ১৮৬, ১৮৭) বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে নিজ নৈকট্য দানের কৃপাপূর্ণ আশ্বাসও দিয়েছেন। একই স্থানে তিনি একথাও বলেছেন যে তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করবেন আর এর প্রতিউত্তরও দান করবেন। আল্লাহ্ তাআলা যদিও সর্বাবস্থাতেই **'সামিউদ্দোয়া'** (দোয়া শ্রবণকারী) আর **'মুজিবুদ্দাওয়াত'** (আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দানকারী) তদুপরি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই মোবারক মাস রমযানে রোযা পালনের নির্দেশের সাথে বান্দার দোয়া কবুল করার বিষয়টি সংবদ্ধ করে দেয়ার মাঝে এক বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এজন্য রোযা পালনের সাথে সাথে গভীর মনযোগের সাথে দোয়ায় নিমগ্ন থাকার নির্দেশ এক বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে । একই স্থানে আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী কেননা আল্লাহ্ তাআলা এখানে মহানবী (সাঃ)কে সম্বোধন করে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, **"ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নি কারিব উযিবু দা'ওয়াতাদ্ দায়ে ইযা দায়া'নি"** অর্থাৎ তোমাকে যখন আমার বান্দা জিজ্ঞাসা করে (উত্তরে বল) আমি নিশ্চয় নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর ডাকে উত্তর দিয়ে থাকি।

মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আমাদেরকে ঐ পদ্ধতি অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র সত্তা এবং তাঁর জীবন চরিতের প্রতিটি মুহূর্ত এ কথার সাক্ষী যে খোদা তাআলার সাথে তাঁর (সাঃ) পরিপূর্ণ নৈকট্যের জীবন্ত সম্পর্ক ছিল, এবং তিনি (খোদা তাআলা) সর্বদাই তার (সাঃ) দোয়া কবুল করতেন। এটা তাঁর (সাঃ) কৃত দোয়ার সুফল ছিল যে, শত শত বছরের আধ্যাত্মিক মৃতরা তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার কল্যাণে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আর মূক ও বধিরেরাও ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, এমন ভাষা যে তা আধ্যাত্মিক দর্শনের গভীর তত্ত্বাবলীতে সমৃদ্ধ ছিল।

অতএব, এ পবিত্র মাস রমযান আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, যদি আমরা চাই যে, খোদা তাআলা আমাদের দোয়া কবুল করুন আর আমাদের যাচনাগুলোকে স্বীয় জ্যোতির্ময় অনুগ্রহ দ্বারা ভরে দিন, তবে আমাদের জন্য অবশ্য করণীয় যে আমরা যেন মহানবী (সাঃ) এর ঐ আধ্যাত্মিক দর্শন, যা খোদা তাআলার সান্নিধ্যে ও নৈকট্য দানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে, তা বুঝতে ও পালনে নিজেরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টিত হই। মহানবী (সাঃ) এর আজ্ঞানুবর্তি হয়ে তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের কল্যাণে আমরা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে রসুলে করীম (সাঃ) কৃত দোয়ায় যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা লাভে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ্। এভাবে আমরা **'মুহ্সিন'** (কল্যাণদাতা) ও **'মান্নান'** (অনুগ্রহকারী) খোদার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়ে তাঁর (সাঃ) কল্যাণ বিতরণ ধারার মাঝে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সক্ষম হবো।

আল্লাহ্ করুন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজের আনুগত্যকারী মু'মিন বান্দাদের জন্য যে সব নেয়ামতের ভান্ডার রেখে গেছেন আমরা যেন সে ভান্ডার লাভের যথার্থ হকদার হই। আর যুগখলীফার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ববাসী দ্রুততার সাথে রসূলে করীম (সাঃ) এর দোয়ার ঐ কল্যাণপূর্ণ ভান্ডার থেকে আশিস লাভে অগ্রগামী হয় – আগত পবিত্র মাহে রমযানে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এটাই হবে আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

৩১ আগষ্ট, ২০০৭

সূচীপত্র

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)	৭-১২
• জুমআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)	১৩-২০
• হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তম চরিত্রের অনুকরণীয় আদর্শ মাহমুদা ইসলাম	২১-২২
• সিয়াম সাধনা একটি ইবাদত আলহাজ্জ্ব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩-২৬
• মুহাম্মদী নবুওয়তের অফুরন্ত ধারা এবং ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের জয়যাত্রা আমীর মাহমুদ ভূইয়া	২৭-৩০
• খেলাফতে আহমদীয়া মুহাম্মদীয় নবুওয়তের দ্বিতীয় বিকাশ আলহাজ্জ্ব এ, কে, রেজাউল করীম	৩১-৩৩
• উকিলে আ'লার দপ্তর থেকে অনুবাদক ঃ বশীর উদ্দীন আহমদ	৩৪-৩৫
• সংবাদ	৩৬-৩৯
• একই পুকুরে কই-মাগুর-শিং মাছের সমন্বিত চাষ	৪০
• ভাদ্র মাসের কৃষি	৪১-৪২

প্রচ্ছদ:সালানা জলসা ২০০৭, বেলজিয়াম
ছবি : ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

৬২। আর তোমরা যে কোন কাজে (ব্যস্ত) থাক না কেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে (সমাগত) কুরআনের যে অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের (এসব কাজে) নিমগ্ন থাকা অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে ও আকাশে অণু পরিমাণও কিছু গোপন নেই। আর এর চেয়ে ছোট[১২৭৩] বা এর চেয়ে বড় সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬৩। শুন! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা মর্মাহতও হবে না[১২৭৪]।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬৪। যারা ঈমান এনেছিল ও তাক্ওয়া অবলম্বন করেছিল,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

৬৫। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনেও এবং পরকালেও। আল্লাহ্‌র কথায় কোন পরিবর্তন নেই। এটাই পরম সফলতা।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১২৭৩। কিছু কিছু বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতির দরুন লুক্কায়িত থাকে আবার অন্য কতকগুলোর বিশালতার দরুন সেগুলোর অংশবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি এতই প্রখর এবং তীক্ষ্ণ যে, কোন জিনিষ যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন তা তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকতে পারে না এবং তা যত ব্যাপক, যত বৃহৎ বস্তুই হউক না কেন এর কোন অংশই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

১২৭৪। 'ভীতি' মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মের সঙ্গে এবং 'মর্মাহত' অতীত কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

হাদীস শরীফ

রসুলের ভালবাসা

কুরআন ঃ

তুমি বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়। (আলে ইমরান ঃ ৩২)

হাদীস ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মেন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ হতে প্রিয় হই। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এই বিশ্বের জন্য সর্বকালের নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা সর্বকালের জন্য শরীয়ত রূপে কুরআন প্রেরণ করেছেন। তাঁর দ্বারাই খোদা তাআলা সমগ্র বিশ্বের জন্য ইসলামকে তাঁর মনোনীত ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আজ আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যতিরেকে আর কোন পথ নেই। খোদা প্রাপ্তির জন্য হযরত খাতমুন্নাবীঈন (সাঃ)-ই একমাত্র মাধ্যম তিনি যে পথ আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন আজ আমাদেরকে সেই পথের পথিক হতে হবে। সেই পথের পথিক হতে হলে আমাদেরকে হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। সে জন্যে প্রয়োজন নিজের জীবনে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভালোবাসা সৃষ্টি করা। হযরত রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমাকে তোমাদের অনুসরণ করার অর্থ হলো, মুমেন হওয়া এবং তোমারা মুমেন ততক্ষণ হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি হতে প্রিয় হই। খোদার ভালবাসা পেতে হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই খোদাকে পাওয়া যাবে।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা আধ্যাত্মিক জগতের সিরাজুম মুনীর তথা দীপ্তিমান সূর্য বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ আমরা সেই সূর্য হতে বহু দূরে সরে আছি বিধায় আমাদের এই দূরাবস্থা। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে গেছি। খোদার আশীষ ও রহমত পেতে হলে তাই আজ আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসায় বিলীন হয়ে তাঁর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রিয় ও মহান নবীকে ভালোবেসে তাঁর জীবনাদর্শ নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করার তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাঃ
মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কাম সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়

....খোদা তাআলা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নাই, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলে দিয়েছেন। যথা ঃ (১) না-মাহ্‌রাম নারীকে দর্শন হতে পুরুষের চক্ষুকে বাঁচানো। (২) না-মাহ্‌রাম পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ হতে নারীর কানকে বাঁচানো (৩) না- মাহ্‌রাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের সম্বন্ধে গল্প শ্রবণ না করা। (৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। (৫) বিবাহ না হলে, রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা জোর দাবীর সাথে বলছি যে, এই সকল চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখতে হবে এবং তা এই যে, মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তা হতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হতে পারে না। বরং মহাবিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই খোদা তাআলা আমাদিগকে পবিত্র মনোভাব নিয়ে না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকদের অবাধে দর্শন করার, তাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখে এবং তাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করবারও অনুমতি দেন নি। বরং আমাদেরকে তাকিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোককে এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নয় ; তাদের সুকণ্ঠ, তাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নয় ; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুসম ভয় ও ঘৃণা করি, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদা তাআলা চান যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেজন্য তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী শিক্ষা দান করেছেন।

এতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম নরম রুটি রেখে আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই রুটির কোন খেয়াল জন্মাবে না, তবে আমরা আমাদের এ ধারনা পোষণে ভুল করব। সুতরাং খোদা তাআলা চেয়েছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

ইসলামী পর্দার এটাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং এটাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার পবিত্র গ্রন্থে পর্দার উদ্দেশ্য এটা নয় যে স্ত্রীলোকদেরকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখা। এরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞ লোকেরা রাখে যারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হলো স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরস্পরকে অবাধ দর্শন থেকে ও পরস্পরের শোভা সৌন্দর্যের আকর্ষণ হতে বিরত থাকা। কারণ এতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, চোখ অবনত রেখে অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হতে আত্মরক্ষা করার এবং সমগ্রভাবে দর্শন-যোগ্য জিনিষ দেখার যে পন্থা, তাকে আরবী ভাষায় **'গায্‌যেবসর'** বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয় পবিত্র রাখতে চান, তাঁর পক্ষে মানবেতর জন্তুদের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা অবাধে চেয়ে দেখা উচিত নয়। বরং তার পক্ষে সামাজিক জীবনে **'গায্‌যেবসর'**-এর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। এটা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস, যার ফলে তার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হবে, অথচ তার সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে কোন বিঘ্ন ঘটবে না। এই চরিত্রগুণকেই ইহ্‌সান ও ইফ্‌ফাত বা কামপ্রবৃত্তির পবিত্রতা বলা হয়।

(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি পুস্তকের বাংলা সংস্করণ ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

"স্মরণ রাখুন! যুগের আহ্বানকারী এবং মসীহ্ ও মাহ্দীর ডাকে যেহেতু সাড়া দিয়েছেন তাই অন্য সকল প্রভু থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর 'রব্ব' যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর সমীপে ঝুঁকতে হবে। তাঁর মহিমা কীর্তন আর প্রশংসারত অবস্থায় জীবন-যাপন করতে হবে।

সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কতৃর্ক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬ (১লা ফাতাহ্ ১৩৮৫ হিজরী শামসি) এর জুমআর খুৎবা।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দু ফা উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর্ রহ্মানির রহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস্সিরা তাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

"কুল্ ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্লাযীনা তাদউনা মিন দু'নিল্লাহি লাম্মা জায়ানিয়াল বাইয়্যিনাতি মির্রব্বী ওয়া উমিরতু আন উসলিমা লিরব্বিল্ আলামীন" (সূরাতুল মু'মেন:৬৭)।

গত খুতবায় আল্লাহ্তা'লার 'রব্ব' বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন আয়াত পেশ করেছিলাম যাতে আল্লাহ্তা'লার সে সকল নির্দেশাবলীর প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল যাতে তিনি বলেন যে, হে আমার বান্দাগন! যদি সত্যিকারের জীবন কামনা কর তাহলে আমার ইবাদতের প্রতি মনযোগী হও নতুবা স্মরণ রেখ পরিনতির দায় দায়িত্ব স্বয়ং তোমার উপর বর্তাবে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, দেখ! আমি তোমাদের সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, তোমাদের খোদা এক ও অদ্বিতীয় খোদা, যিনি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক, আর যিনি হৃদয়ের গভীর থেকে 'রব্বানা' ধ্বনির সাথে নির্গত দোয়া শ্রবণ করেন। কেবল প্রয়োজনের সময়ে তোমাদের আহাজারি ও দোয়াই নয় বরং না চাইতেই তোমাদের জাগতিক আরাম-আয়েশের জন্য, তোমাদের প্রশান্তির নিমিত্তে রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করে প্রত্যেকের উপর খোদাতা'লা অনুগ্রহ করেছেন আর এটি অনেক বড় একটি অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের প্রত্যুত্তরে একজন মু'মেন বান্দার কাছে কৃতজ্ঞতার প্রেরণা ব্যতীত অন্য কিছু কাম্য হতে পারে না, একজন বিশ্বাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন অভিব্যক্তির আশাই করা যেতে পারে না। সুতরাং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ সর্বদা আল্লাহ্তা'লা; যিনি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর ইবাদতের প্রতি মনযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় আর কখনই এমন কোন পরিস্থিতি যেন না আসে যখন তুমি শয়তানের বিভ্রান্তিতে পতিত হও। এজন্য বিবেক-বুদ্ধি খাটাও আর সর্বদা সে সকল নেয়ামতকে স্মরণ করতে থাকো যাতে পৃথিবী ও আকাশ এবং এর অভ্যন্তরীন ও এতদুভয়ের মাঝের সকল সৃষ্টির প্রতিটি জিনিষ অন্তর্ভূক্ত এবং যেখানে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণ সরবরাহ করেছেন।

এরপর তোমাদের দৈহিক কাঠামো, তোমাদের শক্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উত্তম আকৃতি, তোমাদের খাদ্য-পানীয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অগনিত রিযক ও নেয়ামত তোমাদেরকে সরবরাহ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ; আমাদের প্রভু আল্লাহ্তা'লা ফসল থেকে আমাদের জন্য বিভিন্ন জিনিষ সরবরাহ করেছেন। খাবারের জন্য অগনিত প্রকার রসদেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয়ের ব্যবস্থাও আল্লাহ্তা'লার সৃষ্ট বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে হয়ে যায়, শরীর ঢাকার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থার কথা ভাবুন; তাও ফসল থেকে লাভ হয়। তারপরে স্থল ও জলজ পশু-পাখি রয়েছে তাদেরকেও খোদাতা'লা খাদ্যপোকরণ সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রের তলদেশে বসবাসকারীদেরকেও, সমুদ্রের উপরভিাগেও, পানির উপরে ভাসমান পক্ষীকুলের মধ্যে এবং স্থলভাগে বসবাসরত পশু-পাখিদের মধ্যেও। এরপর এসবের মধ্য থেকে খাদ্যদ্রব্যের

পাশাপাশি আমাদের জীবন ধারণের লক্ষ্যে পানীয়ের উপকরণেরও ব্যবস্থা করেছেন। শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষার জন্যও পশুদের মধ্য থেকেও উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর বাহনেরও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের প্রভু সুন্দর পোশাকের জন্য একটি পোকাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। সে পরিশ্রম করে আমাদের জন্য ভালো রেশম প্রস্তুত করে, যা পরিধান করে অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হবার পরিবর্তে একে নিজের জন্য গৌরব ও অহংকারের মাধ্যম বানিয়ে নেয়।

এ যুগে যেখানে বাহন হিসেবে বিভিন্ন প্রাণীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে বা কম ব্যবহার হয়ে থাকে সেখানে মাটি থেকে এমন এক শক্তিরবিধান করেছেন যার সাহায্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ সহজ হয়ে গেছে। সামুদ্রিক ভ্রমণও আরামদায়ক হয়ে গেছে, মানুষ বায়ু মন্ডলকেও তাঁরই সাহায্যে আয়ত্ব করেছে। মোটকথা; আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবীর যে সকল নেয়ামত প্রদান করেছেন, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর যে সকল বস্তু আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন তা অগণিত। তার নাম উল্লেখ করতে গেলে একটি দীর্ঘ্য তালিকা তৈরী হবে।

কত! প্রকারের নেয়ামতে তিনি মানুষকে ভূষিত করেছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, অধিকাংশ মানুষ এ জন্য আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌তা'লা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এসব কিছু একজন আহমদীর কাছে এ দাবী করে যে, কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতে যেন তাঁর ইবাদত করা হয়। দৃষ্টি বুলিয়ে দেখুন, চিন্তা করে দেখুন, কেবলমাত্র সেই একজন প্রভুই আমাদের চোখে পড়বেন যা পবিত্র কুরআন আমাদের দেখিয়েছে এবং আঁহযরত (সা:) যেদিকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনিই সেই প্রভু যিনি আমাদেরকে এসব নেয়ামত প্রদান করছেন, যিনি সমগ্র জগতের প্রভুপ্রতিপালক। সুতরাং এ সকল নেয়ামত প্রদানের ফলে তিনিই প্রশংসার অধিকারী আর ইবাদতের যোগ্য; মানুষের বানানো ছোট-ছোট 'রব্ব' এমন নয় যাদের প্রতি মনযোগ দেয়া যেতে পারে। তারা কিছুই দেয়ার ক্ষমতা রাখে না বরং তারা স্বয়ং নিজেকে রক্ষা করা আর সামলানোর জন্যও অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই এ সবকিছুর প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করার পরে আল্লাহ্‌তা'লা আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর শিক্ষা অবতীর্ণ করতঃ এই ঘোষণা করিয়েছেন, যেভাবে আমি পূর্বে তেলাওয়াতে বলেছি 'কুল ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্লাযীনা তাদউনা মিন দু'নিল্লাহ্' অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তাদের ইবাদত করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। অন্য কারো সম্মুখে অবনত হবার প্রশ্নই উঠে না। সরল-সোজা পথ প্রদর্শিত হবার পর এই প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, আমি অবাধ্যদের অন্তর্ভূক্ত হব। আমি আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন দেখেছি যা আমার ঈমানকে দৃঢ় করছে। তাই আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এই ঘোষণা করছি যে, 'ওয়া উমিরতু আন উসলিমা লিরব্বিল্ আলামীন' অর্থাৎ, 'আমি সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।' আমি অকৃতজ্ঞদের ন্যায়, প্রভুকে যারা চিনেনা তাদের মত গয়রুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের) সম্মুখে ঝুঁকতে পারি না। এত উজ্জল নিদর্শনাবলী এবং নিজ প্রভুর এত অনুগ্রহরাজি সত্বেও আমি অন্য কারো ইবাদত করবো! সে প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সেই 'রব্বুল আলামীন' এর ইবাদতের দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা হবে যাঁর জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার পরে অসহায় এবং নেতৃত্ব বিহীন রাখেন নি। বরং এ যুগেও আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বানী এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে একজন আহ্বানকারী অবতীর্ণ করেছেন। যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের জাগতিক ও বাহ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাঁর প্রতিপালনের বিকাশ ঘটাচ্ছেন সেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ:)-কে আবির্ভূত করে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরকে তাঁর দিকেআসার পথসমূহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন আর পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একজন পথ প্রদর্শকও প্রদান করেছেন। আমরা সেই পথ প্রদর্শকের মান্যকারী এবং এই ঘোষণাকারী যে, 'রব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিআইয়্যূ নাদিলিল ঈমানে' অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি।' যে তোমার পক্ষ থেকে প্রেরীত এবং আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি, তোমার এই নেয়ামতের আমরা মূল্যায়ন করছি আর তোমার কাছেই দোয়া করছি। আমাদেরকে ঈমানের উৎকর্ষতা দান কর। একজন সচেতন, বিবেকবান মানুষ, একজন বিশ্বাসী যিনি আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শনাবলী দেখে ঈমান এনেছেন, যাকে আল্লাহ্‌তা'লা পথ দেখিয়ে তাঁর প্রেরিতকে গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি এসব কিছু দেখে তাঁর প্রভুর পূর্ণ আনুগত্য না করার কথা ভাবতেও পারেন না। তাই আহ্‌মদীর ঘোষণা হলো এই, আর এটিই হওয়া উচিত যে, আমরাতো নিজ প্রভুর নির্দেশানুযায়ী যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর সকল নির্দেশের উপর আমল করতঃ পুরো আনুগত্যের সাথে তাঁর সম্মুখে অনুগত হই এবং তাঁর সমীপে এই নিবেদন করি, 'রব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফীর আন্না সাইয়্যেআতিনা ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা মায়াল আবরার' (সূরা আলে ইমরান:১৯৪) অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ থেকে দূর কর, এবং আমাদেরকে পূণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দাও।'

আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে এই নিবেদন করছি, এখন যেহেতু আমরা এই ইমামকে মেনেছি, তোমার নির্দেশাবলী অনুসারে চলার চেষ্টা করছি, তাই আমাদের এই দোয়া কবুল কর যেন আমরা এখন কোন প্রকারের নোংরামিতে লিপ্ত না হই, কোন প্রকারের ভুল-ভ্রান্তির আমরা যেন শিকার না হই। সদা যেন পাপ মুক্ত থাকি, সুতরাং হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও এবং সব ধরণের পাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখ। যখন আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় হবে, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হবার সময় আসবে তখন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে যেন পূণ্যবানদের মাঝে গণ্য হই । আমরা যেন তাদের মাঝে গণ্য হই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে স্বীয় ঈমানকে সংশোধন ও দৃঢ় করেছে, নিজ ঈমানকে সর্বদা পৃথিবীর নোংরামী ও ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রেখেছে, কিন্তু সর্বদা আমাদের এটি স্মরণ রাখা উচিৎ যে, যদি আমাদের দোয়ার সাথে আমাদের কর্মের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে আমাদের আনুগত্য কখনই পূর্ণ আনুগত্য হবে না আর যখন পূর্ণ আনুগত্য হবে না তখন দোয়াও হয় না বরং তা মুখ নিঃসৃত ফাঁকা বুলি হবে।

সুতরাং সর্বদা আমাদের আত্মিক বিশ্লেষণ করতে হবে যে, আহ্‌বানকারীর আহ্‌বান শুনে আমরা যে ঘোষণা করছি 'হে আমাদের প্রভূ আমরা তোমাকে স্বাক্ষী রাখছি যে, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি; আমাদের এই ঘোষণা কি বস্তুনিষ্ঠ? এটি কি আনুগত্যপূর্ণ ঈমান? আমরা কি সত্য বুঝে নিজ প্রভুকে স্বাক্ষী রেখে তাঁকে ডেকেছি? নাকি পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এ আওয়াজ ও এ ধ্বনি উত্তোলন করেছি, কিন্তু 'রব্ব' বৈশিষ্ট্যের সত্যিকার উপলব্ধি ও জ্ঞান আমাদের নেই আর এই ধ্বনি কেবল বুলি সর্বস্ব অন্তঃসার শুন্য দাবী। তাহলে এই ফাঁকা বুলি আমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সত্যিকার অর্থে সে প্রেরণায় সমৃদ্ধ করুন যা এই দোয়ার পিছনে থাকা উচিৎ। স্বীয় প্রভুকে আহ্‌বান করার সময় আমাদের মাঝে একটি বেদনার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়, আমরা নিজ প্রভুকে বেদনার সাথে ডেকে স্বয়ং নিজেকে পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করি, আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আমাদেরকে সত্যিকারের নেক বানিয়ে দাও। তারপরে এই বিশ্লেষণও করতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখেন? আর আমরা কতটুকু তাঁর আকাংখা প্রত্যাশা ও শিক্ষার উপরে অনুশীলন করছি। যখন আমরা আমাদের প্রভুর কাছে পূণ্যের পথে চলার আর এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া করি এ দৃষ্টিকোন থেকে করি, যে তিনি 'রব্বুল আলামীন' এবং আমাদের প্রভুর নির্দেশাবলী সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীমালার জন্য প্রযোজ্য। আমাদের প্রভুর শিক্ষা ইউরোপের জন্য আর আমেরিকার জন্যও, এশিয়া আর দ্বীপ সমূহের জন্যও। একইভাবে আফ্রিকার জন্যও। এ ভূপৃষ্ঠের জন্যও, পুরো পৃথিবী, গোটা আকাশমালা আর সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যও। পুরো সৃষ্টি জগত তাঁর আয়ত্তাধীন। যেখানেই মানুষ রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যখন সেখানে মানুষ পৌঁছবে আমাদের প্রভুর সকল নির্দেশাবলী তার জন্যও প্রযোজ্য হবে। এত ব্যাখ্যা আমি এজন্য করছি যে, যখন আমি খুতবা বা বক্তৃতায় কোন কথা বলি তখন অনেক আহমদী মনে করে এই নির্দেশনা কেবল যেখানে খুতবা প্রদান করা হচ্ছে সে স্থানের জন্য প্রযোজ্য। একজন আহমদীর এরূপ আচরণ শোভনীয় নয় বরং কোন আহমদীকেই এটি মনে করা উচিৎ নয় যে, আমি যে দেশে খুতবা অথবা বক্তৃতায় খোদাতা'লার শিক্ষার আলোকে কোন কথা বলি তা কেবল সেই দেশের জন্যই। বরং যেখানেই আহমদী রয়েছেন তাদের সবাই সম্বোধিত। আমরা যখন এটি মনে করবো তখন আমাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবে আর তখনই আমরা এক 'রব্বুল আলামীনের' মান্যকারী সাব্যস্ত হবো। সম্প্রতি আমি এক খুতবায় পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী ও শাশুড়ী-বউ সম্পর্ক বিষয়ে একটি খুতবা প্রদান করেছিলাম। তারপরে লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় পর্দা সম্পর্কে আমি মহিলাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছি এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি। শুনেছি যে, বিভিন্ন দেশে অনেক মহিলা ও পুরুষ এ কথা জিজ্ঞেস করছে অথবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে; যে বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তা কি কেবল যুক্তরাজ্যের জন্য নাকি আমরা সবাই এতে সম্বোধিত? অতীতে হয়তো বিশেষ স্থানের জন্য কিছু কথা বলা হতো কিন্তু এখন যোগাযোগের সুবিধার কারণে সারা বিশ্ব এক হয়ে গেছে এজন্য নোংরামিও প্রায় একই ধরণের। আল্লাহ্‌তা'লা বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুধাবন করতঃ আমাদেরকে এমটিএ'র নেয়ামতে ভূষিত করেছেন, যেন সেই প্রভু! যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক তাঁর শিক্ষা থেকে বিচ্যুতদের দ্রুত মনযোগ আকর্ষণ করা যায়। যদি এক স্থানে অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পূণ্যও সেখানে অতি দ্রুত পৌঁছানো উচিৎ। সুতরাং আহমদী যেখানেই হোক না কেন; যদি এটি মনে করে যে, 'ওয়া উমিরতু আন উসলিমা লিরব্বিল্ আলামীন' অর্থাৎ, 'আমি সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট' নির্দেশের সম্বোধিত, তাহলে সে বিষয়াদী যা আমাদের প্রভু আমাদেরকে বলেছেন, যা আমি আমার খুতবা ও বক্তৃতায় বর্ণনা করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে

বর্ণনা করি তা বিশ্বের সর্বত্র বসবাসকারী সকল আহমদীর জন্য প্রযোজ্য। এজন্য কথা না মানার অজুহাত অন্বেষণ উচিত নয় বরং প্রত্যেককে এর সম্বোধিত মনে করা উচিত।

যখন পূর্ণ এতায়াত, আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর উপর অনুশীলন আর তাঁর ইবাদতের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করবেন তখন আমরা নিজ প্রভুকে সম্বোধন করে মৃত্যুর সময়ে পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবার দোয়া করতে পারবো। এই দোয়া করবেন, 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার সকল নির্দেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দাও যাতে আমরা তাদের মাঝে গন্য হই যারা পূর্ণ অনুগত এবং কেবল তোমারই ইবাদতকারী আর যারা 'ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদ্‌খুলী জান্নাতী'র (সূরাতুল্ ফজর:৩০-৩১) পুরস্কার অর্জনকারী। একজন মু'মেনের কাজ হচ্ছে, এই মর্যাদা লাভের জন্য ঈমান আনার পর তথা এ ঘোষণার পরে যে, আমি ঈমান এনেছি, এই প্রার্থনা করা যে, 'রব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নে'মাতাকাল্লাতী আনআমতা আলাইয়্যা' (সূরাতুন্ নমল:২০) অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি, যা তুমি আমার উপর করেছ।' সেই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ, নিজ প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ যিনি আমাদের উপর এ কল্যাণ করেছেন, ঈমান আনয়নের তৌফিক দিয়েছেন। এর পাশাপাশি আমাদের এদিকেও মনযোগ দিতে হবে এবং আমাদের এরূপ প্রার্থনা করা উচিৎ যে, 'ওয়া আন আ'মালা ছালিহান তারযাহু ওয়া আদখিলনী বিরহমাতিকা ফী ইবাদিকাছ্ ছালিহীন (সূরাতুন্ নমল:২০) অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু! সেই সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক দাও যা তুমি পছন্দ কর আর এরফলে তুমি নিজ করুণায় আমাদেরকে তোমার পূণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত কর।' তাই পূণ্য সংকল্পের সাথে এই দোয়াকারী এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে 'ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদখূলী জান্নাতী'র পুরস্কার অর্জনকারী হয়। যখন আমরা নিজ প্রভুর কাছে তাঁর শিখানো দোয়া করি তখন এর আবশ্যিক শর্তাবলী পূর্ণ করাও কর্তব্য। আমরা জানি এই অবশ্য করণীয় বিষয় হচ্ছে সৎকর্ম করা। এই খুতবা অমুকের জন্য আর এই বক্তৃতা তমুকের জন্য এর অর্থ স্বয়ং নিজেকে নিজ দোয়া থেকে বঞ্চিত করা।

একদিকে আমরা বলি যে, আমরা নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করি; আমাদেরকে তোমার নিকটতম স্থান দান কর, অন্যদিকে বলি যে, এটিই দোয়া কিন্তু এই দোয়া আমাদের শর্ত অনুযায়ী আমরা করতে চাই। বিশ্বের কোথাও এই রীতি নেই যে, ভিখারী বলবে যে আমাকে দাও আর আমার শর্ত অনুযায়ী আমাকে দাও। এমন ব্যক্তিকে বিশ্ব পাগল ব্যতীত আর কি বলতে পারে। এমন লোককে নির্বোধ মনে করা হবে। কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় মানা হয়েও থাকে।

কয়েক দিন হলো একজন আমাকে লিখেছেন, আমার বিয়ে হচ্ছে না, পাকিস্তানের রিশ্‌তানাতা বিভাগ সাহায্য করছে না। যখন আমি রিপোর্ট আনালাম তো জানা গেল, অনেক বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে কিন্তু পছন্দ হয়নি আর কারণ হচ্ছে, ছেলে বলেছে আমার শর্ত অনুযায়ী বিয়ে হতে হবে। নিজে মেট্রিক পাশ, পড়াশুনা কম আর শর্ত দিয়েছে মেয়ে যেন শিক্ষিত হয়, এম এ পাশ হয় আর চাকুরীজীবি ও উপার্জনকারিনী হয়, বিয়েতে যেন বাড়ী (যৌতুক) দেয়া হয়, দশ-বিশ লক্ষ নগদ টাকাও যেন পাই, আমার খরচও যেন বহন করে, কেবল খরচ বহন করবে শুধু তাই নয় বরং শ্বশুর বাড়ী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে আমাকে যেন কাজ করতে বলা না হয়। যখন আমার ইচ্ছে হবে কাজ করবো নতুবা করবো না। এমন লোককে মানসিক রোগী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এধরণের বিবাহ আর এমন ছেলের প্রতি রিশ্‌তানাতা বিভাগের দৃষ্টি দেয়ারই প্রয়োজন ছিলনা (জানি না কেন তারা মনযোগ দিয়েছে), কেননা যদি এধরণের লোকদের সাথেই বোঝাপড়া করতে হয় তাহলে রিশ্‌তানাতা বিভাগের কর্মকর্তারাও আবার মানসিক রোগী না হয়ে যায়। পরিতাপ হলো, দাবী-দাওয়া তো করে কিন্তু এমনটি কেউ করে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্র যা দেখা যায় তাহলো বিয়ের সময় কিছুই বলে না আর কোন শর্তও আরোপ করে না কিন্তু বিয়ের পরে কার্যতঃ ব্যবহার এমনই হয়ে যায়।

অনেকে অভিযোগ করেন। মেয়ে পক্ষের কাছে অন্যায় দাবী করে থাকে, যদি তাদের মন মত সাড়া না আসে এবং দাবী না মানা হয় তাহলে কলহ-বিবাদ এবং মেয়ে পক্ষকে খোঁটা ও তির্যক কথাবার্তা শুনতে হয়। আল্লাহ্‌তা'লা এদের বিবেক-বুদ্ধি দিন আর করুণা করুন। সুতরাং একজন নির্বোধ আর অত্যাচারী ব্যতীত যে নিজ প্রাণের উপর যুলুম করছে, (কেননা মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌তা'লার উপরতো কেউ যুলুম করতে পারে না) সে এমন কোন কথা বলে বসে যা আসলে তার নিজ প্রাণের উপর যুলুম করার নামান্তর। এমন মানুষ ছাড়া যে নিজ প্রভুর প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের কোন জ্ঞানই রাখেনা, যে জানেই না আমাদের প্রভু আমাদের উপর কি-কি অনুগ্রহ করেছেন! দয়াপরবশ হয়ে আমাদের প্রতি যে বিধি-বিধান প্রদান করেছেন এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমরা সেই দোয়ার কল্যাণ লাভ করতে

পারি যা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন অন্যথায় নয়। একটি দোয়া সূরাতুশ্ শো'আরা'র তিনটি আয়াত সম্বলিত; এতে শিখানো হয়েছে, "রব্বি হাবলী হুকমাওঁয়াল্ হিক্‌নী বিছ্‌ছালিহীন-ওয়াজ্ আল্‌লী লিসানা সিদ্‌কিন ফীল আখিরীনা-ওয়াজ আল্‌নী মিওঁয়ারাসাতি জান্নাতুন নঈম" (সূরাতুশ্ শো'আরা: ৮৪-৮৬) অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত কর; এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত যশ দান কর, এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মাঝে গণ্য কর।' এ ধরণের লোক যারা নিজ প্রভুকে চিনে না আর বিবেক শুন্য তাদের কথা শুনে এই দোয়া করি যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন। সুতরাং আমাদেরকে সর্বদা নিজ প্রভুর কাছে বিবেক-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং সঠিক বিষয় অবলম্বন আর এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করা উচিৎ, এর পাশাপাশি সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি মনযোগ দেয়া উচিৎ।

আল্লাহ্‌তা'লা বহুবার আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন বারংবার যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বারবার আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, 'যারা সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সত্য বলেছেন, শিরক এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছেন, আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আমল করতঃ পুণ্যের বিস্তারকারী ও সত্যবাদী হয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া ছাড়া পুণ্যবানদের মাঝে গণ্য হবার কোন পথ নেই। যাদেরকে সর্বদা তাদের পুণ্যের কারণে স্মরণ রাখা হয় আর উত্তরসূরীদের মাঝে তাদের পুণ্যের কারণে তাদের স্মরণ করা হয় আর এদের দোয়া কবুল করতঃ আল্লাহ্‌তা'লা জান্নাতের নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী করেন। তাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা রাখা আর সত্যবাদীদের মাঝে গণ্য হবার জন্য প্রয়োজন, সঠিক শিক্ষা ও প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করতে থাকা।

নবীদের গন্ডি বিস্তৃত হয়ে থাকে তাঁরা সেই সীমার মধ্যে থেকে স্বীয় প্রভুর কাছে হাত পাতেন এবং প্রত্যেক মু'মেনের পরিধি তাঁর সামর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌তা'লা প্রদত্ত যোগ্যতানুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু, সত্যের মূল-মন্ত্র প্রত্যেকের দৃষ্টি গোচরে রাখা উচিৎ যেন জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীতেও সত্যবাদীদের সাথে তাকে স্মরণ করা হয় আর সে সত্যবাদীদের মাঝে গণ্য হয়। তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও প্রত্যেককে আত্মিক বিশ্লেষণ করতে হবে যেন এমন কোন কর্ম সম্পাদিত না হয়, এমন কোন কথা মুখ থেকে নিঃসৃত না হয় যা সত্য পরিপন্থী। এজন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করতে হবে যেন নিজ প্রভুর অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে আর তাঁর নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী হতে পারে। চাকুরিজীবি অথবা অন্য যে কোন পেশাজীবি হোক পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করা উচিৎ। মানুষের সাথে লেন-দেনের ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হোন।

জামাতের দায়িত্বাবলী তা স্বেচ্ছা সেবার ভিত্তিতে হোক বা জীবন উৎসর্গকারী কর্মী হিসেবে হোক এক্ষেত্রে কখনই কোন প্রকার অলসতা বা সত্য-বিচ্যুত কোন কথা যেন সামনে না আসে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় হিসাব করা উচিৎ, যেন কতটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন তা বুঝা যায়, যেন হৃদয় স্বাক্ষ্য দেয় যে, ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছেন এবং রাতও যেন এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় ত্বাকওয়ার (খোদা ভীতির) মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করেছেন। যদি অহোরাত্র আমাদের সত্যতা ও ত্বাকওয়ার মান বজায় থাকে তাহলে সফলতা; কিন্তু যদি মান নীচে নামতে থাকে তাহলে এই দোয়ার বরাতে বলা যে, আমরা আগত আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, তাঁকে মেনেছি, তা ভুল প্রমাণিত হবে, এটি মিথ্যা, স্বীয় নফসকেও ধোঁকা দেয়া আর খোদাতা'লা যিনি আমাদের প্রভু তাঁকেও ধোঁকা দেয়া বৈ-কি। সুতরাং 'রব্বানা'র ধ্বনি তখনই গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করবে যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সকল নির্দেশ এবং বয়াতের অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা হবে। মানুষ দূর্বল, ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে কিন্তু এগুলোকে দূর করার চেষ্টা করা আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য কামনা করাও প্রয়োজন।

আমি বলেছিলাম (সম্ভবত গত খুতবায় বা তার আগে) আমাদের প্রতিপালক এত দয়ালু যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য আমাদেরকে ইস্তেগফারের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন যেন আমরা আন্তরিকভাবে তাঁর সমীপে ঝুঁকি। তাঁর সমীপে আন্তরিকতার সাথে কৃত ইস্তেগ্ফারকে আল্লাহ্‌তা'লা গ্রহণীয়তার মর্যাদা প্রদান করেন আর তা কবুল করেন। বলেন, 'ক্বালা রব্বি ইন্নী জালামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাগাফারালাহু ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রহীম (সূরাতুল কাসাস:১৭)। "সে বলল, 'হে আমার প্রভূ! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের উপর যুলুম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" এই দোয়া যা এখানে বর্ণিত হয়েছে, এটি কোন গল্প বা কাহিনী হিসেবে লিখা হয়নি। বরং এজন্য বলা হয়েছে, যদি তুমি আন্তরিকভাবে নিজ প্রভুর কাছে চাও তাহলে তিনি তোমাদের সাথেও সে

অনুসারেই ব্যবহার করবেন। তাই যখন হৃদয় থেকে দোয়া নির্গত হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষমার আচরণ করেন। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক আহ্‌মদীর সাথে এরূপ ব্যবহার করুন এবং প্রত্যেক আহ্‌মদী যেন নিজ প্রভুর ক্ষমার চাঁদরে আবৃত হবার পরে সর্বদা তাঁর নির্দেশের সত্যায়নস্থল হয় আর এর উপর অনুশীলনকারী হয় যে, 'ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়া কুম মিনাস্ সাজেদীন' (সূরাতুল্ হিজর:৯৯) অর্থাৎ, 'তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমাকীর্তন কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হও।' অতএব স্মরণ রাখুন! যেহেতু এ যুগের আহ্‌বানকারীর এবং মসীহ্ ও মাহ্‌দীর আহবান শুনেছেন তাই অন্য সব 'রব্ব' থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 'রব্ব', যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর সমীপে ঝুঁকতে হবে এবং তাঁর পবিত্রতার গুনগান ও মহিমাকীর্তন করে নিজ জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আমাদেরকে সেই সিজদাহ্ করতে হবে, যা এ যুগের ইমাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সেই সিজদাহ্ করুন যা কেবলমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের দ্বারে করা হয়, কেননা তিনিই একমাত্র প্রভু এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু-প্রতিপালক নেই যিনি বিশ্বাসীর হৃদয়ে বা কোন আহ্‌মদীর হৃদয়ে বাস করতে পারেন। তাই সর্বদা একজন আহ্‌মদীর মনযোগ সেই প্রভুর সমীপে ঝুঁকে থাকার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিৎ। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, "দেখ! প্রকৃতপক্ষে 'রব্বানা' শব্দে তওবার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গীত রয়েছে, কেননা 'রব্বানা' শব্দ দাবী করে যে, সে অন্য সকল 'রব্ব' যা সে পূর্বে বানিয়ে রেখেছিল তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই 'রব্ব' এর দিকে এসেছে এবং এই শব্দ সত্যিকারের বেদনা ও বিগলন ছাড়া মানবের হৃদয় থেকে নির্গত হতেই পারে না। ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষদাতা আর প্রতিপালনকারী'কে 'রব্ব' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ অনেক প্রভু বানিয়ে রেখেছে, অনেক প্রতিপালক বানিয়ে রেখেছে, এ শব্দটি 'রব্ব' এর বহুবচন। নিজ চাতুর্য ও প্রতারণার উপর সে পূর্ণ ভরসা করে তাই এটিই তার প্রভু। যদি সে নিজ জ্ঞান ও বাহুবলের অহমিকা রাখে তাহলে সেটিই তার 'রব্ব'। যদি নিজ সৌন্দর্য অথবা ধনসম্পদের গর্ব করে তাহলে সেটিই তার 'রব্ব'।

মোটকথা এরূপ সহস্র-সহস্র কারণ তার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সব কিছু পরিত্যাগ করে এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেই এক-অদ্বিতীয়, সত্য ও প্রকৃত 'রব্ব' এর প্রতি সমর্পিত না হবে এবং 'রব্বানা'র বেদনা-বিধূর ও হৃদয় বিদারক ধ্বনির সাথে তাঁর আস্তানায় পতিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত 'রব্ব'কে চিনবে না। সুতরাং যখন এরূপ দহন ও বিগলিত চিত্তে তাঁর সমীপে নিজ পাপ সমূহ স্বীকার করে তওবা করে আর তাঁকে সম্বোধণ করে, 'রব্বানা' অর্থাৎ প্রকৃত ও আসল প্রভুতো তুমিই ছিলে কিন্তু আমরা ভুল বশতঃ অন্যত্র হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, এখন আমি সে সকল মিথ্যা প্রতিমা ও বাতিল উপাস্যদের পরিত্যাগ করেছি এবং নিষ্ঠার সাথে তোমার 'রব্ব' হওয়াকে স্বীকার করছি, তোমার দহলিজে আশ্রয় চাচ্ছি–বস্তুত এমনটি করা ছাড়া খোদাকে স্বীয় প্রভু মান্য করা কঠিন কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানব হৃদয় থেকে অন্য সকল 'রব্ব' আর তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম প্রদানের অবসান না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত 'রব্ব' তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। অনেকে মিথ্যাকেই নিজ 'রব্ব' বানিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, "মিথ্যা ছাড়া আমাদের চলাই দায়।" এছাড়া চলা যাবে না। "অনেকে চুরি রাহাজানি ও প্রতারণাকে নিজেদের 'প্রভু' বানিয়ে বসেছে। তাদের বিশ্বাস যে, এই পদ্ধতি ছাড়া তাদের জন্য রিয্‌কের অন্য কোন পথ খোলা নেই। তাই ঐ সকল জিনিষ তাদের 'আরবাব'। দেখ! এক চোর যার কাছে সিঁদ কাটার যন্ত্রপাতি রয়েছে আর তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক রাতও রয়েছে, কোন চৌকিদার, পাহারাদারও নেই, এমন অবস্থায় সে চুরি ছাড়া জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করবে কি? সে তার অস্ত্রকেই নিজ উপাস্য মনে করে। এধরণের মানুষ যারা নিজ প্রতারণার উপরেই বিশ্বাস ও ভরসা রাখে তাদের খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং দোয়া করার কি প্রয়োজন? দোয়ার প্রয়োজন তো তার, যার সকল পথ রুদ্ধ আর তাঁর দ্বার ছাড়া কোন পথ উম্মুক্ত নেই। তার হৃদয় থেকেই দোয়া নির্গত হয়। বস্তুত 'রব্বানা আতিনা ফীদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফীল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকীনা আযাবান নার' এরূপ দোয়া করা কেবল তাদেরই সাজে যারা খোদাকেই নিজের প্রভু মনে করে আর তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভুর সম্মুখে অন্য সকল মিথ্যা 'রব্ব' অসার।" (আল্ হাকাম ৭ম খন্ড ১১নাম্বার, ২৪শে মার্চ ১৯০৩ সন, পৃষ্ঠা ৯-১০, মলফুযাত নব সংস্করণ, ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা) আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে নিজ 'প্রভু'কে চিনবার তৌফিক দিন আর কেবলমাত্র সেই সত্ত্বার সমীপেই যেন আমরা সবাই সিজদাবনত হই।

[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত]

"আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি, যুগ এবং কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমিত নয় বরং তিনি সকল জাতির প্রভু সকল স্থানের প্রতিপালক সকল দেশের তিনিই রব্ব। সকল সৃষ্টি তাঁর হাতেই লালিত-পালিত হয় আর তিনিই সর্ব নির্ভরস্থল।"

সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৬ (৮ই ফাতাহ্ ১৩৮৫ হিজরী শামসি) এর জুমআর খুতবা।

"আল্লাহ্‌তা'লার সকল নেয়ামতের ন্যায় প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য দ্বারাও সবচেয়ে বেশি কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন আঁ-হযরত (সা.)।

হযরত আকদাস নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র জীবনের একান্ত ঈমান উদ্দিপক ঘটনাবলীর উল্লেখ যাতে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট বিশেষভাবে জগমগ করতে দেখা যায়।

"এ যুগে তিনি (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সত্ত্বাতেও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হুযুর (আ:)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রাণ সঞ্জীবনী বিবরণ"

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর রহ্‌মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন ইহ্‌দিনাস্‌সিরা তাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

আল্লাহ্‌তা'লা যিনি 'রব্বুল আলামীন' তাঁর প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন; যদ্দারা সব মানুষ, পশু-পাখি বরং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তথা প্রতিটি অনু-পরমানু কল্যাণ মন্ডিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:-

''রব্বুল আলামীন' কত ভাবগর্ভ একটি শব্দ! যদি প্রমাণিত হয় যে, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রেও জনবসতি রয়েছে তাহলে সেই বসতিও এই শব্দের আওতায় পড়বে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্- রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠার পাদটিকা)

তিনি (আ:) পুনরায় বলেন, **"এ কথা বলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন যে, তিনি 'রব্বুল আলামীন' অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বসতি রয়েছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা দেহ হোক বা আত্মা, খোদাতা'লাই সবার স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।" অর্থাৎ তা জড়দেহ হোক বা আত্মা হোক খোদাতা'লাই এর সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। "যিনি সর্বদা তাদের প্রতিপালন করছেন আর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করছেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে সমগ্র জগতে প্রতিটি মূহুর্ত তাঁর 'রবুবিয়্যত' (প্রতিপালন), 'রহমানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমীয়্যত' (অনুগ্রহ) এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারের ধারা চলমান আছে।"**

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্-রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠার পাদটিকা)

এটি আল্লাহ্‌তা'লার একটি সার্বজনিন কল্যাণ যা প্রত্যেক বস্তুই লাভ করছে অথবা এথেকে সব কিছু অংশ পাচ্ছে বা সবাই এদ্দারা কল্যাণ লাভ করছে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিপালনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার ঐ সকল লোকদের সাথে করেন যারা খোদাতা'লার বিশেষ বান্দা এবং এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছেন নবীগন (আ.) আর নবীদের মধ্যে সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)।

আজ আমি আল্লাহ্‌তা'লার এই বিশেষ বান্দাদের কিছু ঘটনার উল্লেখ করবো যারা আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ব্যবহারের ভাগী হয়েছেন। আমি বলেছি আল্লাহ্‌তা'লার সকল নেয়ামতের ন্যায় 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য থেকেও সবচেয়ে বেশি আশীস লাভকারী হচ্ছেন আঁ-হযরত (সা.)।

আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করবো যা থেকে জানা যায় যে, কিভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিভিন্ন ইচ্ছা এবং প্রয়োজন পূর্ণ করতেন, আর কেবল সরাসরি তিনিই (সা.) নন বরং তাঁর কল্যাণে তাঁর সাহাবীগণও সে সকল নেয়ামত থেকে অংশ লাভ করতেন যা 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের অধীনে আল্‌াহ্‌তা'লা তাঁকে প্রদান করতেন। আমরা সবাই জানি যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্ত্বা জন্মের সময় থেকে বরং তারও পূর্ব থেকে আল্লাহ্‌তা'লার রবুবিয়্যতের এক উজ্জল নিদর্শন। তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভুর বিকাশের মহিমায় ভাস্বর যার বিবরণকে কোন ভাষায় আয়ত্ব করা সম্ভব নয় আর যার বর্ণনা কখনো শেষ হবে না। এতে আধ্যাত্মিক নিদর্শনের দীপ্তিও রয়েছে যদ্দারা খোদাতা'লার রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্য

সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় আর বাহ্যিক-জাগতিক নিদর্শনাবলীও আছে; যা থেকে জানা যায় যে, কিভাবে খোদাতা'লা তাঁর প্রিয়'র সাথে নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন।

সর্ব প্রথম আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাক্যে 'রবুবিয়্যত' এর এক মহান আধ্যাত্মিক দ্যূতির বর্ণনা করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"রব্বুল আলামীন এর বৈশিষ্ট্য কিভাবে আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর কাজ করেছে দেখুন। তিনি একান্ত দুর্বল অবস্থায় লালিত পালিত হয়েছেন। মাদ্রাসা-মক্তবে যাবার কোন সুযোগ হয়নি যেখানে তিনি আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বৃত্তিকে শক্তিশালী করতে পারতেন। কখনই কোন শিক্ষিত জাতির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। ছোট-খাট কোন শিক্ষারও সুযোগ হয়নি, দর্শনের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের কোনও অবকাশ পাননি। তারপর দেখো! এধরণের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও কুরআন শরীফের ন্যায় নেয়ামত তাঁকে (সা.) দেয়া হয়েছে যার সুমহান ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার সামনে অন্য কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব অর্থহীন। কোন মানুষ যদি কিছুটা বুঝে এবং মনযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে যে, বিশ্বের সকল দর্শন ও জ্ঞান, এর সামনে তুচ্ছ এবং সকল বিজ্ঞ ও দার্শনিক এথেকে অনেক পিছিয়ে আছে।"**

(আল্ হাকাম ১৭ই এপ্রিল, ১৯০০ সন পৃষ্ঠা:৩, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বরাতে ১ম খন্ড ১৭১ পৃষ্ঠা)

অতএব দেখুন! যেভাবে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন জীবন্ত গ্রন্থ ছিল, সেই সময়ও সে অবস্থানুযায়ী তাদের জন্য নসীহত ছিল, তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করছিল। আজকে এযুগে যখন মানুষের সম্মুখে নিত্য নতুন বিষয়াদী ও আবিষ্কারাদী রয়েছে, এ সম্পর্কেও এই গ্রন্থ সংবাদ দিচ্ছে আর এ সকল নিদর্শন যে ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন কোন জাগতিক জ্ঞান ও দার্শনীক এর কাজ নয় বরং সেই 'রব্বুল আলামীন' এর কাজ যিনি প্রথম দিন থেকেই তাঁকে (সা.) নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার উঠাবসা, তাঁর স্বভাব, তাঁর প্রশিক্ষণের স্বাতন্ত্র সে যুগেও সবার চোখে পড়তো। এসব প্রশিক্ষণ কোন একাডেমি কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ও কোন ব্যক্তির দয়া-মায়ার উপর নির্ভরশীল ছিলনা বরং এ তরবীয়ত সরাসরি সেই 'রব্বুল আলামীন' এর কাজ। তাই পবিত্র কুরআন তাঁর এ সকল জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত থাকা বরং পড়তে পর্যন্ত না জানার সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রথম ওহীর সময়েই আঁ-হযরত (সা.) বলেছিলেন, **'মা আনা বিক্বারিইন'** অর্থাৎ আমিতো পড়তে জানি না, তখন ফিরিশতা তিনবার নিজের সাথে সজোরে তাঁকে আলিঙ্গন করেন কিন্তু প্রতিবারই তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। তারপর আল্লাহ্তা'লা ওহী অবতীর্ণ করেন **'ইক্বরা বিস্মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা'** (সূরাতুল্ আলাক্ব:০২) 'তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন'। এরপরে দেখুন সেই প্রভু! যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মাধ্যমে জ্ঞান ও মারেফাতের সেই ভান্ডার আমাদেরকে প্রদান করেছেন যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। আপত্তিকারীরা! যাদের মধ্যে বর্তমান পোপও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন, বলেন যে, কুরআন নতুন কি দিয়েছে? সেই প্রথম ওহীতেই আল্লাহ্তা'লা তাঁর (সা.) মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, প্রভু-প্রতিপালকের বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই এতে বিকৃতি সৃষ্টি করেছে আর সেই প্রভুর ধারণা বিকৃত করার পর ছোট-ছোট প্রভু বানিয়ে বসেছে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, আমার এই বান্দার মাধ্যমে প্রভুর সাথে পরিচিত হও যার প্রতিটি কথার সূচনাই নিজ প্রভুর নামের মাধ্যমে হয়ে থাকে যে সম্পূর্ণভাবে আমার লালন-পালনের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে এবং তাঁর জ্ঞান ও মারেফতের পরাকাষ্ঠার উৎসও আমিই। কিন্তু যারা অন্যায় করার জন্য বদ্ধপরিকর, অজ্ঞতা বিদ্বেষ ও শত্রুতা যাদের রীতি তারা আদৌ দেখতে পায় না যে, নতুন কি দেয়া হয়ছে। কুরআন পূর্বেই এ ঘোষণা করেছে যে, এই শিক্ষা তারা বুঝবে না। এরূপ শত্রুতার ফলে এবং না বোঝার কারণে এমন মানুষ পবিত্র কুরআনের নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহ থেকে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বেশী। সুতরাং এটি তাদের নিয়তি। যাই হোক প্রতিপালনের এ মহান উক্তির উল্লেখের পর আঁ-হযরত (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্তা'লার প্রতিপালনের যে সকল দৃশ্য আমরা দেখতে পাই, আমি তার উল্লেখ করছি। যেভাবে আমি বলছিলাম যে, কথাতো কখনই শেষ হবে না তথাপি কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একটি সফরের ঘটনা, একটি কাফেলা একস্থানে শিবির স্থাপন করে কিন্তু সফরের ক্লান্তির কারণে ফজরের নামাযের জন্য সময়মতো কারো চোখ খুলেনি, সবার চোখ বিলম্বে খুলেছে। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, এস্থান পরিত্যাগ কর, এখানে অবস্থান করো না। তারপর কিছুদূর গিয়ে অযু ইত্যাদী করে নামায আদায় করেন। এরপর একজন সাহাবী নিজ পিপাসার কথা বলেন যে, তৃষ্ণা পাচ্ছে, সেখানে পানি স্বল্পতা ছিল। তিনি (সা.) তাঁর দু'জন সাথীকে পানি আনার জন্য পাঠান। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্তা'লা কি কি ব্যবস্থা করেছেন যা আপন জনদেরও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে আর অপরকেও হতবাক করেছে। এটি একটি সুদীর্ঘ হাদিস, প্রথম অংশ বাদ দিয়ে আমি এটুকু নিচ্ছি। লিখা হয়েছে, "লোকেরা তাঁর কাছে পিপাসার কথা বলেন, তিনি নেমে আসেন এবং কাউকে আহবান করেন আর হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমরা দু'জন যাও আর পানি খুঁজে আনো। তারা দু'জন বেরিয়ে পড়লেন এবং একজন মহিলাকে উটের উপরে পানির দু'টি মশক (চামড়ার থলে)-এর মধ্যে বসা অবস্থায় দেখতে পান; তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পানি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? সে বলে, আমি গতকাল এসময় অমুকস্থানে পানি দেখেছি এখন আমাদের লোক পিছনে রয়েছে। তারা উভয়েই তাকে বলেন; চলো। সে জিজ্ঞেস করে কোথায়? তারা বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে। সেই মহিলা মুসলমান

ছিলো না; বলে সেই যাকে সাবী বলা হয়। তাঁরা বলেন হ্যাঁ যাই বল, তুমি চলো। তাকে নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে পুরো ঘটনা শুনান। হযরত ইমরান (রা.) বলেন, তাঁরা তাকে উট থেকে নীচে নামিয়ে আনে এবং নবী করীম (সা.) একটি পেয়ালা চেয়ে পাঠান আর তাতে ঐ দুটি মশকের মুখ থেকে পানি ঢালেন আর ফিতা ও রশি দ্বারা উপরের মুখ বন্ধ করে দেন যেভাবে পূর্বে বন্ধ ছিল এবং নিচের মুখ খুলে দেন আর মানুষের মধ্যে ঘোষণা করেন, পানি ভরে নাও। পান কর আর পান করাও। তিনি বলেন, যে যতটুকু চেয়েছে পান করেছে আর পান করিয়েছে। এরপর তাঁর বর্ণনা হলো, সেই পানির প্রচুর পরিমান ব্যবহার হচ্ছিল আর সে মহিলা তা বিমূঢ় দাঁড়িয়ে দেখছিল, আমি একদিনের দূরত্ব থেকে পানি নিয়ে এসেছি জানি না এখন আমার পানির কি হবে। কিন্তু তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! সেই মশকের কাছ থেকে মানুষ এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে তা পূর্বের তুলনায় বেশী পূর্ণ, অর্থাৎ যখন সেই মহিলা পানির মশকদ্বয় নিয়ে এসেছিল।

এত পানি বের করার পরও প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, পানির মশক খালি হবার পরিবর্তে পূর্বের তুলনায় বেশী পূর্ণ ছিল। নবী করীম (সা.) বলেন, এই মহিলার জন্য কিছু (তোহফা) একত্রিত কর। তিনি বলেন যে, তার জন্য শুকনো খেজুর, কিছু আটা এবং যৎসামান্য ছাতু ইত্যাদী একত্রিত করা হয় আর এভাবে তার জন্য যথেষ্ট খাবার জমা হয়ে যায়। সে মহিলাকে তার উটের উপর আরোহণ করানো হয় আর একটি কাপড়ে বেঁধে সেটি তাকে প্রদান করা হয়। তারপর আঁ-হযরত (সা.) বলেন, তুমি কি জান! আমরা তোমার পানি থেকে কিছুই কমাইনি কিন্তু আল্লাহ্‌ই আমদেরকে পান করিয়েছেন। তারপর সে নিজ গৃহবাসীদের কাছে ফিরে আসে আর কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, হে অমুক! তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে? সে বলল, আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। দু'ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয় আর তারা আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায় যাকে সাবী বলা হয় আর আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এই! এই! করেছেন এবং সে এই ও ঐ অর্থাৎ, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর দিকে ইঙ্গীত করে বলেন যে, এর মাঝে সবচেয়ে বড় জাদুকর।"

অতএব দেখুন! সেই বিরান অঞ্চলে যেখানে পানির কোন নাম গন্ধও ছিল না আল্লাহ্‌তা'লা সেই মহিলাকে পাঠিয়ে তাদের সবার জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন। এই হলেন ইসলামের প্রভু! যিনি অভাব দূর করেন। পিপাসার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। বাহ্যত সেই মহিলাকে একটি মাধ্যম বানিয়ে প্রকৃতির নিয়মকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু সেই পানিতে এত বরকত রেখে দিয়েছেন যে, তার পানির মশকে কমতির প্রশ্নই নেই বরং পানি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা সেই মহিলাকেও বিস্ময়াভিভূত করেছে। আঁ-হযরত (সা.) সেই মহিলাকে বলেছিলেন, এটি মনে কর না যে, তুমি আমাদেরকে পানি সরবরাহ কারী! এও মনে কর না যে, আমরা অন্যায় ভাবে তোমার পানি ছিনিয়ে নিয়েছি। এটি একটি বাহ্যিক মাধ্যম ছিল যা একজন মুমেনের ব্যবহার করা উচিৎ নতুবা আমাদের পালনকর্তা এবং আমাদের অভাব মোচনকারী হচ্ছেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, যিনি আমাদেরকেও পান করিয়েছেন আর তোমার পানিতেও কোনরূপ ঘাটতি আসতে দেন নি। সে এ কথায় আশ্চার্যান্বিত হয়ে নিজ পরিবার-পরিজনকে বলেছে, তিনি এক বড় যাদুকর কিন্তু সে কি জানে যে, এটি যাদু নয়, এটি 'রব্বুল আলামীন' এর নিজ বান্দা ও তাঁর সঙ্গীদের প্রয়োজন পূরণার্থে তাঁর প্রতিপালন গুনের বহির্প্রকাশ ছিল।

তারপর যেভাবে আল্লাহতা'লা বলেছেন, আমার বান্দা যেন আমার বৈশিষ্ট্যের রঙ ধারণ করে; আঁ-হযরত (সা.)-এর তুলনায় বেশি কে এতে রঙিন হতে পারতো? তিনি সেই মহিলার পানিতে ঘাটতি না হওয়া সত্বেও বরং বৃদ্ধি পাওয়ার পরও তার এই সেবার কারণে তার জন্য খাদ্য-দ্রব্য একত্রিত করিয়ে তাকে প্রদান করেন। এটিও অনুগ্রহ ছিল যা 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি (সা.) করেছিলেন। এই মহিলা মুসলমানদের পানি পান করিয়ে অথবা আঁ-হযরত (সা.)-কে পানি পান করিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ থেকেও অংশ লাভ করেছে যাতে তার পানিতে কোন ঘাটতির সৃষ্টি হয়নি এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অনুগ্রহ থেকেও অংশ লাভ করেছে।

আরেকটি ঘটনা হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)'র যা বিভিন্ন রঙ্গে, বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এটিও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন গুণের বহিঃপ্রকাশ। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, 'রব্ব' এর একটি অর্থ হচ্ছে দরিদ্রের ক্ষুধা নিবারণকারীও। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-এর কাছ থেকে শুনি। তিনি (রা.) বলেন, "সেই সত্ত্বার কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রাথমিক দিনগুলোতে ক্ষুধার কারণে কিছুটা কষ্ট লাঘবের জন্য আমি নিজ পেটে পাথর বেঁধে নিতাম অথবা মাটির সাথে লাগিয়ে রাখতাম। একদিন আমি মানুষের চলাচলের পথে বসে পড়ি। আমার পাশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর কাছে একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে খাবার খাওয়াবেন, কিন্তু তিনি আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে চলে যান। তারপর হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করি তিনিও একইভাবে চলে যান। তিনি বলেন যে, এরপর আঁ-হযরত (সা.) যখন যাচ্ছিলেন তাঁর কাছেও এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করি। আমার অবস্থা তাঁর চোখে পড়ে, মুচকি হাসেন এবং আমার হৃদয়ের অবস্থা আন্দাজ করেন। তিনি (সাঃ) অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলেন, হে আবু হুরায়রাহ্! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, আমার সাথে আস। আমি তাঁর (সা.) পিছনে রওয়ানা হলাম। যখন তিনি (সা.) গৃহে পৌঁছে ভিতরে যাচ্ছিলেন, তিনি বলেন, আমিও ভিতরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি। আঁ-হযরত (সা.) অনুমতি প্রদান করেন, তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি

ভিতরে যান। তিনি ভিতরে গিয়ে দেখেন, সেখানে দুধের একটি বাটি রাখা আছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন এই দুধ কোত্থেকে এসেছে? গৃহবাসীরা বলেন যে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক মহিলা তোহফা দিয়ে গেছেন। হুযুর (সা.) বলেন, আবু হুরায়রাহ্! তিনি বলেন, আমি বললাম; হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, 'সুফ্‌ফা' বাসীদের ডেকে আন। এরা সবাই ইসলামের অতিথি ছিলেন, তাদের কোন বাড়ী-ঘর বা ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। যখন হুযূরের কাছে সদকার জিনিষ-পত্র আসতো তখন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন স্বয়ং কিছুই খেতেন না আর যদি কোন উপহার আসতো তখন তিনি 'সুফ্‌ফা' বাসীদেরও পাঠাতেন আর নিজেও খেতেন। যাই হোক তিনি বলেন, হুযূরের ডেকে আনার নির্দেশ; আমার একেবারেই মনঃপুত হয়নি। এক পেয়ালা মাত্র দুধ যদি এরা সবাই এসে যায় তাহলে এটুকু কার কি কাজে আসবে। আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেন পান করে কিছুটা শক্তি লাভ হয়। কিন্তু হুযূরের নির্দেশ তাই আমি সবাইকে ডেকে আনলাম। তারপরে তিনি বলেন, যখন সবাই এসে নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করেন তখন হুযূর (সা.) আমাকে নির্দেশ দেন যে, পর্যায়ক্রমে এ পেয়ালা সবার হাতে দাও। তিনি বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম এখন আমি আর এই দুধ পাবো না। যাই হোক তিনি বলেন, আমি প্রত্যেকের কাছে পেয়ালা নিয়ে গেলাম, সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতে থাকেন, সবশেষে আমি পেয়ালা আঁ-হযরত (সা.)-কে দিলে তিনি (সা.) আমার প্রতি তাকান এবং মুচকি হেসে বলেন, আবু হুরায়রাহ্! আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, এখনতো কেবল আমরা দু'জন বাকি আছি। আমি বললাম হুযূর সঠিক। একথা শুনে তিনি বলেন, বস এবং ভালোভাবে পান করো, যখন আমি শেষ করলাম তখন বলেন আবু হুরায়রাহ্ আরো পান করো। আমি আবার পান করতে থাকি, যখন আমি পেয়ালা থেকে মুখ সরাতাম তখন তিনি বলতেন, আবু হুরায়রাহ্ আরো পান করো, যখন আমার পেট পুরোপুরি ভরে গেল তখন আমি নিবেদন করি, যেই সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! এখন আর কোনই জায়গা নেই। সুতরাং আমি পেয়ালা তাঁকে দিয়ে দেই। তিনি (সা.) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন তারপর বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে দুধ পান করেন। (বুখারী কিতাবুর্ রিয্‌যাক, বাব কাইফা কানা আইশুন্ নবীয়ে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ওয়া তাখালিল্লুহিম মিনাদ্ দুনইয়া)

এই হলেন 'রব্ব', যিনি সমগ্র জগতেরও প্রভু-প্রতিপালক, যিনি বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কিত নিয়মের অধীনে এক পেয়ালা দুধ সররবারহ করেছেন তারপর তাতে এত বরকত দিয়েছেন যে, তা অনেক ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণে সক্ষম হয়েছে।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম (সা.) সেহ্‌রী না খেয়ে রোযা রাখতে বারণ করেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো সেহ্‌রী না খেয়েই রোযা রাখেন? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমার প্রভু আমাকে আহার ও পান করান। অনেক সময় হয়ত এমন এমনও এসে থাকে যখন ক্ষুধা তেমন একটা অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সেহ্‌রী ব্যতীত রোযা রাখা থেকে বিরত হয়নি তখন তিনি একদিন তাদের সাথে সেহ্‌রী না খেয়েই রোযা রাখেন, তারপর আরেকটি রোযা রাখেন, এরপর যখন মানুষ চাঁদ দেখতে পায় তখন হুযূর (সা.) বলেন, যদি চাঁদ না দেখা যেত তাহলে আমি বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তোমাদের সাথে এভাবে রোযা রাখতাম। বস্তুত এদের বিরত না হবার কারণে শাস্তি স্বরূপ এবং এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের সামর্থ আমার সমান হতে পারে না, আমিতো আল্লাহ্‌র নবী। (বুখারী কিতাবুস সওমে বাবুত্ তাফকীলে লিমান আকসারাল ওয়াসালা)

এযুগে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর নিষ্ঠাবান দাস এর সাথে আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যবহার করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একাধারে ছয় মাস রোযা রেখেছেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার যৌবনে দৈবক্রমে একজন প্রবীণ বুযুর্গ স্বপ্নে দেখা দেন; তিনি বলেন যে, ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে পথ-প্রদর্শিত হওয়ার জন্য কখনও কখনও রোযা রাখা নবী-পরিবারের সুন্নত।"** অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লার যে নূর তাত্থেকে অংশ লাভের জন্য এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে রোযা রাখাও আঁ-হযরত (সা.)-এর সুন্নত, নবীদের রীতি। **"এ কথার প্রতি ইঙ্গীত করেছেন যে, আমি যেন আহলে বাইত ও রসুলদের এই সুন্নতকে অবলম্বন করি।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এ সময়ে আমাকে আশ্চর্য ধরণের দিব্যদর্শন দেখানো হয়। কয়েকজন সাবেক নবী এবং আউলিয়ার সাথে সাক্ষাত হয়। একবারে জাগ্রত অবস্থায় আমি আঁ-হযরত (সা.), হযরত হুসাইন (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দর্শন করি।"**

তারপর বলেন, **"যখন আমি একাধারে ছয় মাস রোযা রাখি তখন নবীদের একটি দলের সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তাঁরা বলেন, তুমি কেন নিজেকে কষ্টে নিপতিত করেছ এথেকে বেরিয়ে এস।"** তিনি বলেন যে, **"মানুষ যখন এভাবে নিজেকে খোদার পথে দু:খ-কষ্টে নিপতিত করে তখন তিনি পিতা-মাতার ন্যায় দয়াপরবশ হয়ে তাকে বলেন, তুমি কেন কষ্টে নিপতিত।"** এভাবে নিজ বান্দার প্রতি খেয়াল রাখাও প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যেরই কল্যাণ। যাইহোক নবীদের সাথে আল্লাহ্‌তা'লার স্বতন্ত্র আচরণ হয়ে থাকে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্ত্বায় এর সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটেছে এবং প্রত্যেকের সাথে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে হয়ে থাকে।

এ রোযার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহার্য্য ছিল মাত্র কয়েক গ্রাস বরং লিখিত আছে তা কয়েক তোলায় নেমে আসে। নিজ মনিবের দাসত্বে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এই জ্যোতি

প্রদর্শন করছিলেন কিন্তু সবাই এটি করতে পারবে না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এই কষ্ট সাধ্যাতীত ছিল এবং ক্ষমতার বাইরে তাই আঁ-হযরত (সা.) সেহ্‌রী না খেয়ে রোযা রাখতে স্বয়ং বারণ করেছেন।

আরেকটি ঘটনা! যা নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত হয় তাও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষুধার্তদের আহার করানো হয় এবং এক হাজার সাহাবী (রা.) আহার করেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন একজন সাহাবী ঘরে গিয়ে স্ত্রী'কে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কোন খাবার আছে কি? আমি আঁ-হযরত (সা.)-এর অবস্থা দেখেছি। ক্ষুধার কারণে অবস্থা বড়ই কষ্টদায়ক, আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি বলেন, ছোট্ট একটি ছাগল আর সামান্য পরিমাণ আটা আছে। তিনি ছাগল জবেহ্ করে বলেন এটি রান্না কর আর আটা মাখাও আমি ডেকে আনছি। তাঁর নাম ছিল জাবের (রা.)। বলেন যে, আমি গিয়ে অত্যন্ত নিম্ন স্বরে যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়, আঁ-হযরত (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে কিছু মাংস আর যবের আটা আছে, আমি আমার স্ত্রী'কে তা রান্না করার জন্য বলে এসেছি, আপনি কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন এবং আহার করুন। হুযূর (সা.) প্রথমে চতুর্দিকে তাকান এবং ডেকে বলেন, সকল আনসার আর মুহাজির আমার সাথে চল, খাবার খেয়ে নাও, জাবের আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি বলেন যে, ডাক শুনে প্রায় এক হাজার মানুষ ক্ষুধায় যাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সেই সাহাবীরা তাঁর (সা.) সঙ্গী হন। আঁ-হযরত (সা.) বলেন যাও এবং তোমার স্ত্রী'কে বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না আসবো পাতিল চুলা থেকে যেন না নামায় আর রুটি বানানোও আরম্ভ না করে। তিনি গিয়ে স্ত্রী'কে জানালে তিনি বলেন, এখন কি হবে? কিন্তু আঁ-হযরত (সা.) যেখানে খাবার রান্না করা হচ্ছিল সেখানে পৌঁছেই অতি নিশ্চিন্তে পাতিল এবং আটার উপর দোয়া করেন। তারপর তিনি (সা.) বলেন, রুটি বানানো আরম্ভ কর। এরপরে তিনি (সা.) ধীরে ধীরে খাবার বিতরণ আরম্ভ করেন। জাবের (রা.) বলেন, সেই সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই খাবার থেকে সবাই পেট পুরে আহার করেছেন আর তখনও আমাদের পাতিল সেভাবে টগবগ করে ফুটছিল আর রুটি পূর্ববৎ বানানো হচ্ছিল। (বুখারী কিতাবুল মাগাযী হালাতো গায্‌ওয়াতে আহযাব, ওয়া ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড. ৩০৪-৩০৭ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এটি আল্লাহ্‌তা'লার অদ্ভুত আচরণ, বাহ্যিক উপকরণ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু যেভাবে প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের অর্থ ক্ষুধার্তকে আহার করানো চাহিদা পূরণ ও অভাব দূর করা, তিনি এভাবে সামান্য জাগতিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশও রয়েছে যে, তোমরা আমার রঙে রঙিন হও, আমার গুনাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন পরস্পরের প্রতিও যত্নবান হয়। এরফলে তারা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদার প্রতিপালন অর্থাৎ, মানব জাতি এবং মানুষ বহির্ভূতদের অভিভাবক হওয়া এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীকেও নিজ অভিভাবকত্বের গুন থেকে বঞ্চিত না রাখা; এটি এমন একটি কাজ যদি এক খোদার ইবাদত করার দাবীকারী খোদার এই বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসার চোখে দেখে আর তাঁকে পছন্দ করে, এমনকি পরম ভালবাসার কারণে এই ঐশী গুনের পূজারী হয়ে যায় তাহলে এই বৈশিষ্ট্য ও গুন নিজের মাঝে ধারণ করা তার জন্য আবশ্যক যেন নিজ প্রেমাস্পদের রঙ-এ রঙিন হতে পারে। [ইশতেহার ওয়াজিবুল ইজহার. ৪ঠা নভেম্বর-১৯০০, তিরইয়াকুল কুলুবে পরিবেশিত; তফসীর, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১ম খন্ড-১৮৬ পৃষ্ঠা]

এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) যা বলেছেন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মুরব্বী হওয়া এবং নিজ লালন-পালনের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত না করা, এটি মানবের কাজ। এখানে মুরব্বী অর্থ কেবল তরবিয়তকারী নয় যা সাধারণ অর্থে প্রচলিত বরং এর অর্থ হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিপালনকারী। আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হতে হবে আর **'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্'**র নমুনা হতে হবে, এই বোধ-বুদ্ধি ও উপলব্ধি সাহাবীদের মধ্যে অনেক বেশি ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর উপর অনুশীলন করতেন।

রেওয়ায়েতে এসেছে যে, "হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অনেক সাহায্য করতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল মিসতাহ্ বিন ইছাছাহ্। যখন 'ইফ্‌ক' (দূর্ণাম রটানো) এর ঘটনা ঘটেছিল তখন সেও হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা-বার্তা বলে আর তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে। যখন পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা.) নির্দোষ প্রমাণিত হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কসম খান যে, আমি কখনই আর তাকে সাহায্য করবো না। কসম খাওয়ার পরে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, **'ওয়ালা ইয়া'তালি উলুল ফায্‌লি মিনকুম ওয়াস্‌সাআতি আঁইইউ'তু উলিল কুরবা ওয়ালমাসাকীনা ওয়ালমুহাজিরীনা ফী সাবীলিল্লাহি, ওয়াল্‌ইয়া'ফু ওয়াল ইয়াছ্‌ফাহু, আলা তুহিব্বুনা আঁইইয়াগফিরাল্লাহু লাকুম; ওয়াল্লাহু গফুরুর রহীম'** (সূরাতুন্ নূর:২৩) অর্থাৎ, এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য প্রদান না করার কসম না খায়। তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। এরপরে হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় বৃত্তি প্রদান বহাল করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, আমি কখনই বৃত্তি বন্ধ করবো না।" আল্লাহ্‌তা'লার সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের আদর্শ এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর শিক্ষার তত্ত্বজ্ঞানের ফলেই তৎক্ষণাৎ কসম

ভাঙ্গেন যা ভঙ্গ করায় কোন পাপ নেই। আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ পরিপন্থী যে কসম খাওয়া হয় তা ভঙ্গ করা বৈধ এবং আবশ্যক। তাই আল্লাহ্তা'লা বলেন যে, তাঁর প্রতিপালনের আওতায় তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, মানুষের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে দয়া আর ক্ষমাও আছে এবং অন্যান্য অনেক কল্যাণও রয়েছে, এথেকে বেশী বেশী অংশ লাভের জন্য তোমাদেরকেও তা অবলম্বন করা উচিৎ আর কোন জিনিষের বিরুদ্ধে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয়। অভাবী'র অভাব মোচন হওয়া উচিৎ। এমনটি বলা উচিৎ নয় যে, অমুক ব্যক্তি এমন; অমুক কর্মকর্তার সাথে ভালো সম্পর্ক নেই অথবা অমুককে অমুক, কথা ভুল বলেছে তাই যদি এর প্রয়োজনও থাকে তবুও তাকে সাহায্য করবো না। তার প্রয়োজন পূর্ণ করা, তাকে সাহায্য করা, তার ক্ষুধা নিবারণ করা একটি পৃথক বিষয় আর প্রশাসনিক বিষয়াদী আর সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ আলাদা বিষয়।

আঁ-হযরত (সা.) স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্তা'লার গুনাবলী অবলম্বনের পরে অথবা এমন কাজ করার পরও যা আল্লাহ্তা'লারই বিশেষত্ব, এক বান্দা, বান্দাই থেকে যায় এবং প্রভুর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। কোন কোন সময় অনেকে মনে করে যে, আমরা যাদের অভাব দূর করছি হয়ত তাদের প্রভু হয়ে গেছি। সর্বাবস্থায় সে বান্দাই, সুতরাং প্রথমতঃ তাকে খোদার নির্দেশানুযায়ী কোমল ব্যবহার করা উচিৎ, দ্বিতীয়তঃ তিনি (সা.) এতটা সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ ভৃত্যকেও 'আবদী' অর্থাৎ, হে আমার বান্দা! বলে যেন না ডাকে কেননা তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা বরং সে যেন হে আমার ভৃত্য বলে ডাকে, আর কোন ভৃত্য যেন নিজ মালিককে 'রব্বী' অর্থাৎ, হে আমার প্রভু না বলে বরং 'সাইয়্যেদী' অর্থাৎ, হে আমার অভিভাবক! বলে ডাকে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আলফাজ বাবু হুকমিল ইত্‌লাকে লফজাতিল্ আবদী ওয়াল উম্মাহ্)

অতএব অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে, কারো মালিক হিসেবে তাকে লালন-পালনের দায়িত্ব আদায়ের পরও বান্দা বান্দাই থেকে যায় আর প্রভু প্রভুই। তাঁর গুনাবলী আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। যেহেতু মানুষের গন্ডি নির্ধারিত, তাই এসব সাবধানতার কথাও মানুষের স্মরণ রাখা উচিৎ।

যেভাবে গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, খোদাতা'লা এ যুগেও আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে মসীহ্ ও মাহদী দান করেছেন যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্তা'লার সত্ত্বা, 'রব্বুল আলামীন' এর বোধ-বুদ্ধি ও উপলব্ধি দান করিয়ে পূর্ববর্তীদের সাথে একত্রিত করেছেন। যাঁকে আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) নবী আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্তা'লা স্বীয় 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য শেষ করে দেননি বরং এই ধারা নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্তা'লার গুনাবলীর পরিচয় এবং এর উপলব্ধি অর্জন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে যেখানে 'রবু-বিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি লাভ করিয়েছেন সেখানে তাঁর (আ.) সাথে আমাদের প্রিয় প্রভুর ব্যবহারের দৃশ্যও দেখা যায়, যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন। সুতরাং এ যুগে আল্লাহ্র সাথে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন আবশ্যক ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমি ঈমানকে দৃঢ় করা আর খোদাতা'লার অস্তিত্ব মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি।**

পুনরায় তিনি বলেন, **"খোদাকে চেনা নবীকে চেনার সাথে সম্পৃক্ত।"** বলেন, **"নবী খোদা দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।"** এই আয়নার মাধ্যমেই খোদার চেহারা দৃশ্যমান হয়, যখন খোদা নিজেকে প্রকাশ করতে চান তখন নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যিনি খোদার শক্তির বিকাশস্থল আর তাঁর উপর স্বীয় ওহী অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে নিজ প্রভুত্বের শক্তি প্রদর্শন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"খোদাতা'লা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' আয়াত দিয়ে পবিত্র কুরআনের সূচনা করেছেন। তিনি কুরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, একথা সত্য নয় যে, বিশেষ জাতিতে বা কোন বিশেষ দেশে খোদার নবী আসেন; বরং খোদা কোন জাতি ও কোন দেশকেই ভুলেন নি। কুরআন শরীফে বিভিন্ন দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, যেভাবে খোদা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী দৈহিক প্রতিপালন করে আসছেন সেভাবেই তিনি প্রত্যেক দেশকে ও জাতিকে আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের মাধ্যমেও কল্যাণমন্ডিত করেছেন, যেমন তিনি কুরআন শরীফে এক স্থানে বলেন, 'ওয়া ইম্‌মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফীহা নাযীর' (সুরাতুল ফাতির:২৫)**

অর্থাৎ, এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন নবী বা রসূল পাঠানো হয় নি।

সুতরাং কোন তর্ক ছাড়াই এ কথা মেনে নেয়ার যোগ্য যে, ঐ সত্য ও কামেল খোদা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক যাঁর প্রতি প্রত্যেক বান্দার জন্য ঈমান আনা আবশ্যক। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাঁর প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, কোন বিশেষ যুগ পর্যন্তও নয় এবং না কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; বরং তিনি সকল জাতির প্রভু-প্রতিপালক, সকল জায়গার প্রভু-প্রতিপালক এবং সকল দেশের তিনিই প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই সকল কল্যাণের উৎসস্থল এবং সকল দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তার সত্তা থেকে উৎসারিত। সকল সৃষ্ট বস্তু তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত হচ্ছে এবং সকল অস্তিত্বের তিনিই ভরসাস্থল।

খোদার কল্যাণ সার্বজনীন। তা সকল জাতি, দেশ ও যুগকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর কারণ হলো, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং একথা বলতে না পারে খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কিন্তু

আমাদের প্রতি তা করেন নি বা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েতের জন্য ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি বা অমুক যুগে তিনি তাঁর ওহী ও নিদর্শনসহ প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের যুগে তিনি লুক্কায়িত রয়েছেন। অতএব তিনি সার্বজনীন অনুগ্রহ দেখিয়ে এ সকল আপত্তি খন্ডন করেছেন এবং নিজের ব্যাপক গুণ এভাবে দেখিয়েছেন যে, কোন জাতিকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি এবং কোন যুগকেই তিনি দুর্ভাগা সাব্যস্ত করেন নি।" (পয়গামে সুলেহ্, রুহানী খাযায়েন, ২৩তম খন্ড, ৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা)

অতীত কালে নবীরা নিজ নিজ জাতির জন্য আবির্ভূত হতেন। তারপর আঁ-হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে তাঁকে পুরো বিশ্ব জগতের জন্য **'রহমাতুল্লিল আলামীন'** হিসেবে প্রেরণ করে গোটা বিশ্বকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন; আর বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "যেভাবে আঁ-হযরত (সা.) 'খাতামুল আম্বিয়া' সকল নবীর সম্মিলন স্থল ছিলেন সেভাবে এখন আমি 'খাতামুল খোলাফা' এবং এ যুগে পুরো বিশ্বের সংশোধন কল্পে প্রেরিত হয়েছি।" এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এই পয়গাম প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানো, যেন কেউ এটি মনে না করে যে, এই যুগে আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে কোন নবী আসেন নি বা এ কথা যেন কারো অজানা না থাকে। আমরা সৌভাগ্যবান! যারা এ যুগের ইমাম 'আল্লাহ্‌র নবীকে' মেনে আল্লাহ্‌তা'লার 'প্রতিপালন' বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করেছি। তাই এতে উন্নতি করা এবং আরো বেশী কল্যাণমন্ডিত হবার চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব।

প্রতিপালন গুণের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্‌তা'লা যে ব্যবহার করেছেন এখন আমি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

শুরু থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জাগতিকতার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না এজন্য কোন জাগতিক কাজ-কর্ম করতেন না বরং সর্বদা কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ আর এতে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহ্‌তা'লার ধ্যানে মগ্ন থাকাই ছিল তাঁর কাজ। তাই জাগতিক প্রয়োজনাদী পূরণার্থে নিজ পিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হতো। তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এর সংবাদ দেন, একজন মানুষের স্বাভাবিক মানবসুলভ প্রবণতার কারণে তিনি চিন্তিত হলেন, এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "হযরত মরহুম আব্বা জানের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু'র পক্ষ থেকে এই ইলহাম হয়েছে যা আমি এখনই উল্লেখ করেছি" এই ইলহাম আমি এখানে বর্ণনা করিনি, যাই হোক একটি ইলহাম হয়েছিল, 'মৃত্যু সন্নিকটবর্তী'। মানবিক কারণে আমার ধারণা হল আয়ের বিভিন্ন মাধ্যম পিতার জীবিত থাকার সাথে সম্পৃক্ত এরপরে না জানি আমরা কোন্ কোন্ পরীক্ষায় নিপতিত হবো। তখনই দ্বিতীয় ইলহাম **'আলাই সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু'** হয় অর্থাৎ, খোদা কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়। এই ইলহাম বিস্ময়কর প্রশান্তি এবং নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং লৌহ কিলকের ন্যায় আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। সুতরাং মহিমা ও প্রতাপশালী খোদার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি তাঁর এই শুভসংবাদরূপী ইলহামকে এভাবে আমার জন্য বাস্তবায়িত করেছেন, যা আমার ধারণা এবং চিন্তাতীত ছিল। তিনি এরূপভাবে আমার অভিভাবকত্ব করেছেন যে, কখনও কারো পিতাও এমন দায়িত্ব পালন করেন না।" (কিতাবুল বারিয়্যাহ্, রূহানী খাযায়েন ১৩তম খন্ড, ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা)

একটি ইলহামী দোয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,"খোদাতা'লা ইতোপূর্বে কয়েকবার ইলহামের আকারে এই অধমের মুখে এই দোয়া জারী করেছিলেন যে, **'রব্বিজ্ আলনী মুবারাকান হাইসু মা কুনতু'** অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এমন কল্যাণমন্ডিত কর; যেখানেই আমি থাকি না কেন কল্যাণ যেন আমার সাথী হয়। তারপর খোদা স্বীয় স্নেহ ও অনুগ্রহে সেই দোয়া কবুল করেন যা তিনি নিজেই শিখিয়েছিলেন।" প্রথমে দোয়া শিখিয়েছেন তারপর কবুল করেছেন। "আর প্রথমে তারই ইলহামের আকারে মুখে প্রশ্ন জারি করা পুনরায় একথা বলা যে, তোমার আবেদন গৃহীত হলো এটি বান্দার অদ্ভুত মূল্যায়ন।" (বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড ৬২১ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর পাদটিকা।

এধরণের অগনিত ইলহাম রয়েছে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে দোয়া শিখিয়েছেন এবং তা কবুল করেছেন। সুতরাং যেখানে এগুলো দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন, সেখানে প্রতিপালন বৈশিষ্টেরও বহির্প্রকাশ। আরো দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:-

একটি ইলহাম হচ্ছে, **'রব্বি আখ্খির ওয়াক্তা হাযা, আখ্খারাহুল্লাহু ইলা ওয়াক্তিন মুসাম্মা'** অর্থাৎ, হে মহিমান্বিত খোদা! ভূমিকম্প আগমনকে কিছুটা বিলম্বিত কর।

পরবর্তী অংশ হচ্ছে, **'আখ্খারাল্লাহু ইলা ওয়াক্তিন মুসাম্মা'** অর্থাৎ, খোদা; কিয়ামত সদৃশ ভূমিকম্পকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন। (তাযকিরাহ্: ৫৫৬-৫৫৭ পৃষ্ঠা)

এরপরে **'রব্বি আখরিজনী মিনান্ নার'** অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে আগুন থেকে নিষ্কৃতি প্রদান কর।

পুনরায় পরের অংশ ইলহাম হয়েছে, **'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আখ্রাজানী মিনান্ নার'** অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (তাযকিরাহ্: ৬১২ পৃষ্ঠা)

এখানেও পূর্বে দোয়া শিখিয়েছেন পরে কবুল করার প্রমাণ।

আরেকটি দোয়া **'রব্বি আরিনী আনওয়ারাকাল কুল্লিয়্যাহ্'** অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ঐ সকল জ্যোতি দেখাও যা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। **'ইন্নি আনারতুকা ওয়া আখ্তারতুকা'** অর্থাৎ, আমি তোমাকে

জ্যোতির্মন্ডিত করেছি এবং তোমাকে নির্বাচিত করেছি। (তাযকিরাহ্: ৫৩৪ পৃষ্ঠা) এখানেও একই ব্যবহার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কয়েক দিন হল, আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক স্থানে বসে আছি হঠাৎ দেখি অদৃশ্য থেকে আমার সামনে কিছু টাকা এসেছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কোথা থেকে এল। পরিশেষে আমার মনে হল, খোদাতা'লার ফিরিশতা আমাদের প্রয়োজনে এখানে রেখেছে। তারপর ইলহাম হল, 'ইন্নি মুরসিলুন ইলাইকুম হাদীয়্যাতান' অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি সাথে সাথে আমার হৃদয়ে এর যে তা'বীর ইলকা হলো তা হচ্ছে; আমাদের নিষ্ঠাবান বন্ধু হাজী শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব এক ফিরিশতার রূপ ধারণ করবেন আর সম্ভবত তিনি টাকা পাঠাবেন এবং এই স্বপ্নকে আরবী ভাষায় নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। (শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাজীকে লিখিত ৬ই মার্চ, ১৮৯৫ সনের চিঠি, মকতুবাতে আহমদীয়া-৫ম খন্ড, প্রথমাংশের ৩য় পৃষ্ঠা, তাযকিরা:২২৫-২২৬ পৃষ্ঠার বরাতে)**

তারপর এর সত্যায়ন হয়েছে আর ইলহামও পূর্ণতা পেয়েছে।

তিনি বলেন যে, **"১৮ বছর পূর্বের একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'আলহামদুল্লিাহিল্লাযী জায়া'লা লাকুমুছ ছিহ্‌রা ওয়ান্ নাসব' অনুবাদ-তিনি সত্য খোদা যিনি তোমার বৈবাহিক সম্পর্ক একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে করেছেন যারা সৈয়্যদ, আর তোমার বংশকে সম্ভ্রান্ত করেছেন............।"**

তিনি বলেন, **"এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অন্যান্য ইলহামে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি শহরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে যা হলো দিল্লি।"** এটি হযরত আম্মাজানের সাথে দ্বিতীয় বিবাহের সময়কার ঘটনা। **"এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেককে শুনানো হয়েছিল......এবং যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কার্যতঃ ঠিক সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে, কেননা কোন পূর্ব আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই সৌভাগ্যবশত দিল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ পরিবারে আমার বিয়ে হয়।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমার বংশের মাধ্যমে ইসলামের হেফাযতের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রাখা হবে এবং তাথেকে সেই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যে নিজের মাঝে ঐশী আত্মা ধারণ করবে। তাই তিনি পছন্দ করেছেন যেন ঐ পরিবারের মেয়ে আমার বিবাহ বন্ধনে আসে আর তাঁর গর্ভে যেন সেই সন্তানের জন্ম হয় যে বিশ্বে আমার হস্তে সৃষ্ট জ্যোতির ব্যাপক প্রসার করবে। এটি বিস্ময়কর দৈবব্যপার, যেভাবে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সন্তানদের দাদীর নাম শহর বানু ছিল অনুরূপভাবে আমার এই স্ত্রী যিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের মা হবেন তাঁর নাম নুসরাত জাহাঁ বেগম। শুভলক্ষণ হিসেবে এটি এদিকে ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয় যে, খোদা সমগ্র বিশ্বের সাহায্যের লক্ষ্যে আমার ভবিষ্যত বংশের ভিত্তি রেখেছেন। এটি খোদাতা'লার রীতি যে, কোন কোন সময় নামের মধ্যেই এর ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত থাকে।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন-১৫তম খন্ড, ২৭৩-২৭৫ পৃষ্ঠা)

অতএব দেখুন! কোথায় সে সময় যখন পিতার অন্তর্ধানের সংবাদে তিনি (আ.) বিচলিত ছিলেন যে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এখন কোত্থেকে আসবে। আর, কোথায় আল্লাহ্‌তা'লার নিশ্চয়তা প্রদান যে, **'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন্ আবদাহু'**। এই নিশ্চয়তা দিয়ে,আশ্বস্ত করে সেই 'রব্বুল আলামীন' পুরো বিশ্বের সাহায্যের জন্য তাঁর (আ.) বংশের ভিত্তি রেখেছেন। **তারপর এটিও যে, এই বংশের ভিত্তি; যাদের সমগ্র বিশ্বের সহায়তা করতে হবে। এই হচ্ছে প্রভু-প্রতিপালক! যিনি আমাদেরকে আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্যিকার দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে স্বীয় চেহারা প্রদর্শন করেছেন।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"খোদাতা'লা বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমিই তোমাদের প্রতিপালন করে থাকি। যদি খোদতা'লা প্রতিপালন না করেন তাহলে অন্য কেউ লালন-পালন করতে পারে না। দেখ! যখন খোদাতা'লা কাউকে অসুস্থ্য সাব্যস্ত করেন তখন অনেক সময় চিকিৎসক যারপর নাই চেষ্টা করে কিন্তু সে মারা যায়। প্লেগ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ! ডাক্তার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু এই রোগ দূর হয়নি। আসল কথা হচ্ছে, সকল কল্যাণ তাঁর পক্ষ থেকেই আর তিনিই সকল কষ্ট দূরীভূত করেন।"**

পুনরায় বলেন, **'আল্‌হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (সূরাতুল ফাতেহা:২) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক আর সমগ্র জগতের মালিক।" (বদর নাম্বার ২৪, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা; ৩রা জুলাই, ১৯০৩ সন- মলফুযাত-নব সংস্করণ; ৩য় খন্ড ৩৪৯ পৃষ্ঠা)**

পরিশেষে আঁ-হযরত (সা.)-এর একটি দোয়া পাঠ করছি, হাদিসে এভাবে তার উল্লেখ রয়েছে। "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উৎকণ্ঠার সময় এই দোয়া করতেন; আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি সবচেয়ে বড় এবং সহিষ্ণু, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, যিনি মহান আরশের রব্ব, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সম্মাণিত আরশের প্রভু-প্রতিপালক।

(বুখারী কিতাবুদ্ দাওয়াত বাবুদ্ দোয়ায়ে ইনদাল কুরব)

আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বা এবং 'রব্বুল আলামীন' এর সম্মুখে সমর্পিত থাকা ছিল প্রকৃতপক্ষে আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রাত্যহিক রীতি-নীতি। হতে পারে বর্ণনাকারী কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে একান্ত একাগ্রতার সাথে এই দোয়া করতে দেখেছেন আর তা প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, এটি একটি সম্পূর্ণ দোয়া যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে স্বীয় প্রভুর সত্যিকার পরিচয় লাভের তৌফিক দিন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তম চরিত্রের অনুকরণীয় আদর্শ

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (৬৮ঃ৫)

এবং তিনি মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ। (৩৩ঃ ২২)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ

তাঁর মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন। (বুখারী, আবু দাউদ)

সুবহানাল্লাহে ওয়া বে হামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলি মুহাম্মদ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে সমবেত সাক্ষ্য সেটাই যা দিয়েছিল তাঁর জাতি। তাঁর নবুয়তের দাবীর পূর্বেই তাঁর নাম তারা দিয়েছিল আল-আমীন এবং আস্ সুদুক, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবনের সর্বক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

অতি সংক্ষেপে এর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

(১) খোদা তাআলার প্রতি আস্থা ও ভরসা ঃ- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্তম চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলে সবচেয়ে যে বিষয়টি বড় ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো আল্লাহ্‌র উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা, জীবনের কোন মুহূর্তেই খোদাপ্রেমের ফাটল ধরেনি, জীবনের চরম সংকটকালে তিনি যেমন আল্লাহতে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন, তেমনি আবার ধন-দৌলত, লোভ-লালসার আহ্বান বা বিজয়ের চরম উল্লাসও তাঁকে উক্ত বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি।

(২) একদা কোন এক বেদুইন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ আগলে তলোয়ার উঠিয়ে হাঁক ছেড়ে মুহাম্মদ (সাঃ) কে, বলল তোমাকে কে রক্ষা করবে?

এখানে কেউ তাঁর সহায় নেই, মাকড়সার জাল বোনারও সুযোগ নেই। নিমিষেই শত্রুর তলোয়ারে শির খন্ডিত হয়ে পড়বে। একটি কথাই শুধু এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখন তার হত্যাকারীই তার প্রাণ রক্ষাকারী। সে ছাড়া কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না, এই কঠিন সময়ে তাঁর ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেল। খোদার রসূল (সাঃ) দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে পড়ল।

(৩) দৈনন্দিন জীবন রসূল (সাঃ) নামাযে এবং আল্লাহ্‌র যিকর ও ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। আল্লাহ্‌র নামে সব কাজ আরম্ভ করতেন, কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌রই শুকরগুযারী করতেন।

(৪) হযরত ওমরের এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) তাকে বারণ করেছেন, মেরোনা ওকে মেরোনা। মসজিদ ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। মসজিদে প্রস্রাব করার দরুন যদি বেদুইনকে প্রহার করো তাতে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে যা আর কখনো সারবে না।

(৫) **মক্কা বিজয়**–মক্কা বিজয় করে মক্কাবাসীদের এবং কোরেশদের লক্ষ্য করে রসূল করীম (সাঃ) বল্লেন, কোরেশগণ আজ তোমরা কী ভাবছ?

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা উত্তর দেয় ভাবছি আমাদের অদৃষ্টের কথা, ভাবছি তোমার উপর দীর্ঘকাল যে অত্যাচার করেছি, আজ তার কী প্রতিফল দেবে সেই কথা।

খোদার প্রিয় নবী সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী তিনি প্রতিশোধের কথা ভাবতেই পারেন না। বিজয়ের দিনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ, কারো বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন অভিমান আদর্শহারা দিশেহারা মানুষের জন্য হৃদয়ে তাঁর ঢেউ উঠেছে। দ্বীনের নবী (সাঃ) হাসি মুখে বল্লেন, আজ তোমাদের উপর আমার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন অভিশাপ, অপরাধ তোমাদের মাফ করা হলো, তোমরা সব মুক্ত স্বাধীন।

(৬) খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি (সাঃ) সর্বদা অত্যন্ত সরল বা সাদাসিধা ছিলেন, খাবারের মধ্যে লবণ বেশি হলো না কম হলো এসব ব্যাপারে তিনি কখনই কিছু বলতেন না বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল করীম (সাঃ) যব এর রুটিও কখনো পেট পুরে খেতেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) কখনো এক নাগারে তিন দিন পেট ভরে খাননি।

যখন তিনি (সাঃ) খাবার খেতেন বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করতেন এবং খাওয়া শেষ করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন।

কখনো কোন সময়ে তাঁর (সাঃ) বাড়িতে যদি কোন ভাল খাবার রান্না করা হতো তখনই তিনি বাড়ীর সবাইকে নসিহত করতেন, পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রেখো। (বুখারী)

তিনি প্রতিবেশীদেরকে প্রায়ই উপঢৌকন পাঠাতেন।

(৭) পোশাকের ব্যাপারে সরলতা ঃ হযরত নবী করীম (সাঃ) পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত সাদাসিধা ব্যবস্থাই পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ তাঁর (সাঃ) পোশাক ছিল পাঞ্জাবী ও লুঙ্গি বা পাঞ্জাবী ও পায়জামা।

তিনি (সাঃ) রাজা বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠি পত্রে ব্যবহারের জন্য আরবী হরফে তাঁর নামাঙ্কিত একটি আংটি বানিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বলে দিয়েছিলেন সেটা যেন সোনার আংটি না হয়, রূপার হয়, কেননা, খোদা তাআলা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য সোনা পড়া নিষেধ করে দিয়েছেন।

(৮) <u>বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে সরলতা</u> ঃ তাঁর (সাঃ) এর বিছানা পত্রও ছিল নিতান্ত সাদাসিধে, সাধারণতঃ একটি চামড়া কিংবা উটের পশম দিয়ে তৈরী একটি কাপড়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন–আমাদের বিছানা এত ছোট ছিল যে, যখন রসূল করীম (সাঃ) রাত্রে ইবাদতের জন্য উঠতেন, তখন আমি এক পাশে গিয়ে জড়ো সড়ো হয়ে থাকতাম। এর কারণ এটাই ছিল যে, বিছানাটা ছিল ছোট। ইবাদতের জন্য তিনি যখন খাড়া হতেন তখন আমি হাঁটু সোজা করতে পারতাম। আর যখন তিনি সিজদা করতেন তখন আমি হাঁটু জড়ো করে নিতাম।

(৯) নবী করীম (সাঃ) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচার্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন।

তিনি (সাঃ) কখনও কাউকে প্রহার করেননি–কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে। রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে উটদিগকে খাবার খাওয়াতেন, ঘরে টুকি-টাকি কাজ করতেন, জুতো ঠিক করতেন, কাপড় রিপু করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙ্গানোর সময় গোলামগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন, বাজার থেকে জিনিস পত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াকে হেয় মনে করতেন না। ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে একই ভাবে মোসাফা করতেন। তিনি (সাঃ) সর্ব প্রথম সালাম দিতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না, যদিওবা সেই নিমন্ত্রণ মাত্র খেজুরের হতো। তিনি দুঃখীদের পরিত্রাণে দান করতেন। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তিনি প্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন, তিনি হাসতেন কিন্তু উচ্চস্বরে নয়, তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না, তিনি বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু নীচমনা ছিলেন না, কখনো লোভের বশবর্তী হয়ে হস্ত প্রসারিত করেন নি।

(১০) <u>নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ</u> ঃ নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেন তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারী অধিকার কায়েম করেন। একবার নামায পড়ার সময় একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেলেন এবং সেই কারণে তিনি (সাঃ) তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলেন, পরে বল্লেন, "একটা বাচ্চা কাঁদছিল, আমার মনে হলো ওর মায়ের মনে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে।

তিনি (সাঃ) যখন মহিলাদের নিয়ে কোন সফরে যেতেন, তখন তিনি (সাঃ) ঘোড়া ও উটগুলিকে ধীরে ধীরে চালাতে বলতেন, একবার এই রকম এক অবস্থায় যখন সৈনিকেরা তাদের ঘোড়া ও উটের লাগাম ঢিলা করে দিয়ে জোরে তাড়া করতে শুরু করল তখন তিনি (সাঃ) বললেন, আরে করছ কি তোমরা! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো! অর্থাৎ মেয়েরাও তো সঙ্গে আছে। তোমরা যদি এভাবেই উটকে দৌড়াতে থাক তাহলে তো ঐ কাঁচগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

তিনি স্ত্রীলোকদের আবেগ অনুভুতির প্রতি এতটা খেয়াল রাখতেন যে, তিনি সর্বদাই নসিহত করতেন যে, যারা বাহিরে সফরে যায় তাদের উচিত শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফেরা। যাতে তাদের সন্তানদের কষ্ট না হয়।

(১১) **বাবা মায়ের প্রতি ভালবাসা** ঃ শৈশবে বাবা মাকে হারালেও যখনই বাবা মায়ের কথা মনে হতো তখনই তিনি অধীর হয়ে পড়তেন। একবার মদিনা থেকে হুদায়বিয়া যাত্রাকালে পথে তিনি তাঁর মায়ের কবরের পাশে আসেন এবং শোকে বিহ্বল হয়ে কঁচি শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। তার সাহাবীরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জবাব দিযেছিলেন, "এটি আমার মায়ের কবর, প্রভু আমায় এখানে আসার সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং আমি আমার মায়ের স্মৃতিচারণ করছি এবং তার মধুর স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলায় আমি কেঁদেছি।" মাত্র ছ' বছরের শিশুকালে যিনি তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন তিনি দীর্ঘকাল পরেও মায়ের সেই সুখ স্মৃতিকে আগলে রেখেছেন মনের ভিতরে কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি আমাদেরকে বলেছেন, মায়ের সেবা করতে। তিনি বলেছেন যে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত। আল্লাহ্ এবং তার রসূলের (সাঃ) শিক্ষার বিরোধী নয় বাবা-মার এমন সব নির্দেশ মানা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

শুধু নিজের মাকেই নয়, ধাত্রী-মা হালিমাকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর সম্মানে মাথার পাগড়ী বিছিয়ে দিতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রের বিষয়বস্তু এমন কোন বিষয়-বস্তু নয়, যা কয়েক পৃষ্ঠার মাধ্যমে বর্ণনা করে শেষ করা যায় কিংবা মাত্র কয়েকটি দিকের আলোচনা করেই সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর (সাঃ) উত্তম চরিত্র অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন
কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা
ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ওয়া বারেক
ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।"

–মাহমুদা ইসলাম
মিরপুর

সিয়াম সাধনা

একটি ইবাদত

ইসলামী ইবাদতের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ হলো সিয়াম সাধনা বা রোযাব্রত। চান্দ্রবছরের নবম মাসের নাম রমযান। এ মাসে রোযাব্রত পালনের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ তাবারক তাআলা। সুতরাং রোযা ২৯টিও হতে পারে এবং ৩০টিও হতে পারে। প্রথমে যে বছরে রোযা রাখার আদেশ এসেছিল তখন ছিল গরমের দিন। রোযার দরুন রোযাদার ক্ষুধাপিপাসার জ্বালা অনুভব করে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে রমযান। রোযা 'রামাযা' মূল শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হওয়া, জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। রমযান মাসের সাধনা বা ইবাদত বন্দেগী মানুষের অভ্যন্তরস্থ পাপ ও ক্লেদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এমন কি সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিরও উদ্রেক করে। তাই সিয়াম সাধনা বা রোযা পালন ইসলামের একটি বিশেষ অবদান। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে ধর্মে সাধনা নেই সে ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না" (ফাতওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

আরবী ভাষায় রোযাকে 'সাওম'ও বলে। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা ও কোন কাজ না করা। শরীয়তের পরিভাষায় ফজর (অর্থাৎ সুবহে সাদেক) থেকে নিয়ে সুর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের উদ্দেশ্যে খাওয়া পান করা এবং যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোযা। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেনঃ

"তোমরা খাও এবং পান কর এমন কি তোমাদের সাদা সূতা কালো সূতা থেকে পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ ফজর হয়ে যায়। অতএব এর পর রাত নেমে আসা পর্যন্ত সারা দিন রোযা পুরো কর (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াত) খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খাওয়া পান করা এবং যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকার আদেশের অর্থ হলো সব রকম পাপ থেকে সুরক্ষা লাভ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং এ ধরনের কর্মকান্ড পরিহার করে না তার খাওয়া পান করার মাঝে আল্লাহ্ তাআলার কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী, কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ২৫৫)।

রোযা সম্পর্কে ঐশী ফরমান

মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে বলেন, **ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ কুতিবা আলাইকুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন** অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সিয়াম বা রোযাব্রত বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী (অর্থাৎ খোদাভীরু) হতে পার (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)। এর পরবর্তী আরও ৫টি আয়াতে রোযার অন্যান্য বিধিবিধান, উদ্দেশ্য এবং অভিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও বিভিন্ন জাতি ধর্মের লোকের মাঝে রোযা বা উপবাসব্রত পালনের বিধান প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফাসলু মা বায়না সিয়ামিনা ওয়া সিয়ামি আহলিল কিতাবি আকালাতুস্ সাহারি অর্থাৎ আমাদের এবং আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া (মুসনাদ, দারিমী, বাবু ফাযলুস্ সাহুর, ১৭৪ পৃষ্ঠা)। এথেকে বুঝা যায়, আহলে কিতাবের মাঝে রোযার প্রচলন ছিল। হিন্দুদের মাঝে বিভিন্ন তিথিতে উপবাসব্রত পালনের প্রচলন আমরা এখনও দেখতে পাই। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে `Fasting' শীর্ষক অংশে লেখা আছে By the greater number of Religion in the lower middle and higher cultures alike fasting is largely prescribed অর্থাৎ সভ্যতার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মে উপবাসের বা রোযার প্রচলন রয়েছে। কোন কোন ধর্মে এমন রোযা রয়েছে যাতে কেবল আগুনে পাক করা খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ এবং সাধারণ ফলমূল ও দুধ ইত্যাদি খাওয়া হয়ে থাকে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে, রোযার নিয়ম কানুন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে একমাত্র ইসলাম ধর্মেই পূর্ণরূপে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে।

রোযার উদ্দেশ্যাবলী

রোযা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। কেননা, মানুষ যেখানে একদিকে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে ভোগ বিলাস পরিহার করে সেখানে অন্যদিকে নিজের আত্মার কল্যাণের জন্যে অধিক থেকে অধিকতর পুণ্য অর্জনে ধাবিত হয়। সর্বোপরি সব ধরনের অবৈধ ও অপসন্দনীয় বস্তু ও আচার আচরণ পরিহার করার শিক্ষাও রোযার মাঝে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন–যেন মু'মিনগণ তাক্ওয়া লাভ করতে পারে। আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে যারা হালাল ও বৈধ বস্তু বা বিষয় যখন পরিত্যাগ করতে পারে তখন আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে যে তারা বিরত থাকতে পারে বা পারবে তা বলাই বাহুল্য। রোযা মানুষের মাঝে সেই প্রবণতা সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায়। আর সেক্ষত্রে রোযা ঢালের কাজ করে। যেহেতু রোযা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যেই রাখা হয় তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কুল্লু আমালিবনি আদামা লাহূ ইল্লাস সিয়ামু ফা ইন্নাহূ লী ওয়া আনা আজযী বিহী ওয়াস সিয়ামু জুন্নাতুন অর্থাৎ (আল্লাহ্ তাআলা বলেন,) আদম সন্তানের সব কাজ তার নিজের জন্যে কিন্তু রোযা আমার জন্যে। আর তাই আমি নিজেই এর প্রতিদান। আর রোযা ঢালস্বরূপ (বুখারী, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ২৫৫)।

রমযানের আসল উদ্দেশ্য এই, এ মাসে মানুষ খোদা তাআলার জন্যে সবকিছু পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার ক্ষুধার্ত থাকা এর প্রমাণ বহন করে যে, সে খোদার উদ্দেশ্যে নিজ অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। খাওয়া পান করা মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বামী-স্ত্রী সংসর্গও মানবীয় অধিকার। তাই যে ব্যক্তি এসব অধিকার পরিহার করে সে এ

ঘোষণাই দেয়, খোদার খাতিরে সে তার বৈধ অধিকারও ছেড়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। অবৈধ অধিকার ছেড়ে দেয়া তো তার কাছে কোন মূল্যই রাখে না। আর কারও অধিকার ক্ষুন্ন করবে কোন মু'মিনের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করা যেতে পারে না । আসলে কঠিন বিষয় হলো চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্তন।

রোযার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং পবিত্র খলীফাগণের (রাঃ) মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাণীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"অল্প আহার ও ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্যদর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। একটি খাদ্যকে কম করে অন্য একটি খাদ্য বৃদ্ধি করা হলো খোদার অভিপ্রায়। রোযাদারকে সব সময় এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। খোদা তাআলার যিক্‌র ও স্মরণের মাঝেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মায়া ও মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এই, মানুষ এক খাদ্য পরিহার করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যেন এটা তার আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখে আনুষ্ঠানিক রোযা রাখেনা তার কর্তব্য সে যেন সব সময় আল্লাহ্ তাআলার হামদ (প্রশংসা), তাস্‌বীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং তাহলীল (তৌহীদের ঘোষণা)-এর মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এতে যেন তার দ্বিতীয় খাদ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) বলেন, "যে-ব্যক্তি রোযা রেখে নিজের সেসব বস্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরিহার করে যেগুলো ব্যবহার করতে তার জন্যে আইনতঃ বা নীতিগতভাবে কোন অপরাধ নেই তাহলে এতে তার এমন অভ্যেস গড়ে উঠে যে, সে অন্যদের জিনিষ পত্র অবৈধভাবে ভোগ করে না এবং ওগুলোর প্রতি তাকায়ও না। আর সে যখন খোদার জন্যে বৈধ জিনিষপত্র পরিহার করে সেক্ষেত্রে তার দৃষ্টি অবৈধ জিনিষের প্রতি পড়তেই পারে না" (আল ফযল, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন ঃ

"রমযানের আসল উদ্দেশ্য এই, এ মাসে মানুষ খোদার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার অভুক্ত থাকা এ কথার চিহ্ন ও নিদর্শন হয়ে থাকে যে, সে তার প্রতিটি অধিকার খোদার জন্যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। খাদ্য ও পানীয় মানুষের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সংসর্গও মানুষের অধিকার। অতএব যে-ব্যক্তি এসব পরিত্যাগ করে সে যেন একথা বলছে, অবৈধ বস্তু ছেড়ে দেয়া তো সামান্য কথা আমি খোদার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। আর কারও অধিকার খর্ব করে কোন মু'মিনের কাছ থেকে এ প্রত্যাশাও করা যায় না। মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা হলো এই, খোদা তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে সে তার বৈধ অধিকার ছেড়ে দেয়। কিন্তু রমযান যদি এসে যায় এবং এমনি এমনি শেষ হয়ে যায় আর আমরা বলি, আমরা কিভাবে আমাদের অধিকার ছেড়ে দেই? তাহলে এর অর্থ এটাই দাঁড়ায়, আমরা রমযান থেকে কিছু শিখতে পারিনি। কেননা, রমযান একথা শিখাতে এসেছিল, খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ন্যায্য অধিকারও ছেড়ে দেয়া আবশ্যক" (আল ফয়ল, ৩০ মার্চ, ১৯২৬, পৃষ্ঠা ৫-৬)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) রমযানের ইবাদত সম্পর্কে বলেন ঃ

"মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রাথমিক হলো রোযা রাখা। দ্বিতীয় ফরয নামায ছাড়াও রাত জাগা অর্থাৎ নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সব ধরনের মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয় বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা (কমপক্ষে পুরো কুরআন একবার এ মাসে খতম করা-প্রবন্ধকার)। চতুর্থ দান খয়রাত করা এবং পঞ্চম প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা" (খুতবা জুমুআ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে) রমযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন ঃ

"সবচেয়ে মহিমান্বিত সেই দরবার, অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত লোকদের দরবার। এটা অর্ধেক রাত্রে বসে। এ হলো তাহাজ্জুদের দরবার। এ হলো সেসব লোকের দরবার যারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে সংগোপনে খোদার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তারা উঠে খোদার সমীপে হাজিরা দিয়ে থাকে। আঁ হযরত (সাঃ) আমাদের অবহিত করেছেন, সে সময় অধিক সংখ্যক ফিরিশ্‌তার অবতরণ ঘটে। আর খোদা তাআলার সাথে বান্দাদের সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চলমান থাকে। সেই ব্যবস্থাই লায়লাতুল কদরের আকারে এক অসাধারণ মর্যাদা ও মহিমার সাথে রমযান মাসেও দ্বিতীয়বার সূচিত হয়। আর সেই সাধারণ ব্যবস্থা সাক্ষাতের জন্য বসে যায়। এর একটা নিজস্ব মহিমা আছে............তাই আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি রমযানের দরবারকে যদি জীবিত রাখতে চান, এর কল্যাণরাজি প্রবহমান রাখতে চান তাহলে সেই দরবারে হাজিরা দিতে ভুলবেন না। তাহলে পরে দেখতে পারবেন, কোন রমযানই ইনশাআল্লাহ্ কল্যাণ নিয়ে পালাবে না বরং চিরস্থায়ী কল্যাণরাজি আপনাদের ঝুলির মাঝে ভর্তি হতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এ সৌভাগ্য দিন (খুতবা জুমুআ, ২৪-৪-১৯৯০)।

আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন ঃ

"রোযা কেবল এক সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত খাওয়া বা পান পরিহার করার নাম নয়, এতে তাক্‌ওয়ার উচ্চ স্তর লাভ হয়ে যাবে। যেভাবে আমি বলছি, রোযার সাথে অনেক প্রকার মন্দ কর্মও পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতও আগের চেয়ে বেশি বেশি করতে হবে। তখনই তাকওয়া লাভ হবে এবং উৎকর্ষও লাভ হবে।"

"জোর করে নিজেকে কষ্টে ফেলা পুণ্য নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার আদেশ নিষেধ পালন করাই পুণ্য। নিজ পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা ঠিক নয়। যে আদেশ সুস্পষ্ট এর ওপর আমল করা উচিত। আর এটা খুবই সুস্পষ্ট আদেশ যে, রুগ্ন ও মুসাফির রোযা রাখবে না। তাই কল্যাণ আদেশ পালন করার মাঝেই। জোর করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টার মাঝে কল্যাণ নিহিত নয়" (জুমুআর খুতবা, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৯-১০-০৪, ৪-১১-০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)।

"যতগুলো পাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে এর উৎস হলো চারটি বিষয়। অবশিষ্টগুলো হলো শাখা প্রশাখা। সেই চারটি উৎস হলো ঃ (১) খাদ্য (২) পানীয় (৩) যৌন সম্ভোগ এবং (৪) নিষ্কর্মা থাকা।

সব পাপ এ চারটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এ চারটি উৎস থেকে সৃষ্ট পাপ থেকে বিরত রাখার জন্যে রোযা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি অবিশ্বস্ততা এজন্যে করে থাকে যে, সে পরিশ্রমকে ভয় পায় অর্থাৎ পরিশ্রম করে রুজি রোযগার করতে অনীহা দেখায় এবং এর ফলশ্রুতিতে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে। কিন্তু রোযাদারকে রাতের অনেকাংশে উঠে ইবাদত করতে হয়। সেহরীর জন্যে ওঠে। সারা দিন মুখ বন্ধ রাখে। কম ঘুমায়। এক মাস পর্যন্ত রোযাদারকে এ কষ্ট করতে হয়। এতে তার অলসতার অভ্যাস দূরীভূত হয়। আবার খাদ্য পানীয় এবং যৌনাচার থেকেও পাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্যেও রোযা রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। মানুষ খাদ্য পানীয় পরিহার করে। দৈনন্দীন জীবনের প্রয়োজন পরিহার করে। অতএব যেসব প্রয়োজনের কারণে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় সেগুলো থেকে সাময়িকভাবে বাধা দেয়া হয়" (আল ফযল, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৬)।

রোযার দৈহিক কল্যাণও রয়েছে। মানব দেহ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। এর কারণে তার মাঝে সহনশীলতা ও ধৈর্যের উপকরণ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে উপোসের গুরুত্ব চিকিৎসা শাস্ত্র মতে স্বীকৃত। রোযা রাখার ফলে দেহের ময়লা ক্লেদ দুর হয়ে যায়। গাড়ীর ন্যায় রোযা বছরে দেহের এক প্রকার ওভার হ্যলিং-এর কাজ দিয়ে থাকে। বছরে এক মাস নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ তন্ত্রও গুলোও পুনঃকার্যক্ষমতা লাভ করে থাকে। ডাক্তাররা কোন কোন বিশেষ রোগের জন্যে দীর্ঘদিনের উপবাসের তথা রোযা রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন রোযা রাখার ফলে অনেক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে গেছে বলে জানা যায়।

মোটকথা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে রোযাদার তার বৈধ পানাহার ও স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। দিনের বেলায় সে এসব কাজ থেকে বিরত থাকে। রাতের বেশ একটা অংশ ইবাদতের মাধ্যমে কাটাতে চেষ্টা করে। রাতকে এক কথায় ক্বিয়ামুল লায়ল বা জাগ্রত রাখে। এতে সে নিজের মাঝে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার সিফাত বা গুণাবলী আত্মস্থ করার সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ্ তাআলা খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর পিপাসা লাগে না। তিনি নিদ্রা যাপন করেন না। এমনকি বংশ বৃদ্ধির জন্যে তাঁর প্রজননেরও প্রয়োজন হয় না। তাঁর বান্দা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এসব কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর বিকাশক হওয়ার জন্যে সিয়াম বা রোযার মাধ্যমে এ সাধনাই করে থাকে। সে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রথমে নীতিবান মানুষ ও পরে আল্লাহ্ তাআলার মানুষে পরিণত হওয়ার জেহাদ করে থাকে। আসলে ইবাদতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও এটাই। বান্দার এহেন চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে বান্দা প্রভুর অতি কাছে পৌঁছে যায়। তখন উভয়ের মাঝে ভাবের আদান প্রদান মোকালেমা-মোখাতাবা" (কথোপকথন সম্ভাষণ) হতে থাকে। বান্দা আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করে। সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে ঃ

"আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'আমি কাছে আছি। আমি প্রর্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পেয়ে যায়।"

রোযাদারের মকাম ও মর্যাদা

হাদীসে এসেছে-ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদীন বিইয়াদিহী লাখালুফূ ফামিস্ সাইমি আত্বইয়াবু ইনদাল্লাহি মির রীহিল মিস্‌কি অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যার কব্জায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণ। রোযাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কস্তুরী থেকেও অধিক পবিত্র ও সুগন্ধি (বুখারী কিতাবুস সিয়াম, পৃষ্ঠা ২৫৫)।

আল্লাহ্ তাআআ স্বয়ং রোযাদারের পুরস্কার বা তিনি নিজ হাতে এর পুরস্কার দিবেন এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের উল্লেখ এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে-মান ক্বামা রামাযানা ঈমানাঁওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহূ মা তাক্বাদ্দামা মিন যানবিহী অর্থাৎ যে-ব্যক্তি ঈমান ও চাহিদানুযায়ী এবং পুণ্যের নিয়্যতে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং (দিনে) রোযা রাখে তার বিগত (দিনের) পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় (বুখারী, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ২৬০)।

রোযার তথ্যগত বিষয়াদি

রোযার প্রকার ভেদ

কুরআন ও হাদীসে অনেক প্রকার রোযার উল্লেখ এসেছে। রোযা প্রথমত দুই প্রকার ; যেমন (ক) ফরয রোযা (খ) নফল রোযা।

(ক) ফরয রোযা-(১) রমযানের রোযা (২) রমযানের কাযা বা থেকে যাওয়া রোযা (৩) যিহার (অর্থাৎ স্ত্রীর পিঠকে মায়ের পিঠের মত বলা)-এর কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা, (৪) খুনের কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা (৫) কসম খাওয়ার কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা (৬) মানতের রোযা (৭) তামাত্তো হাজ্জ বা কিরান হাজ্জের রোযা (৮) ইহরাম অবস্থায় শিকার করার কাফ্‌ফরা হিসেবে রোযা এবং (৯) ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মোড়ানোর কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা।

(খ) নফল বা অতিরিক্ত রোযা ঃ (১) শাওয়ালের ৬টি রোযা, (২) আশুরার রোযা (৩) দাউদ (আঃ)-এর রোযা অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা এবং পরের দিন রোযা না রাখা (৪) আরাফাতের দিন,রোযা রাখা ও (৫) প্রত্যেক ইসলামী (হিজরী কামরী) মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের (আইয়াম বেজের) রোযা।

এ ছাড়া কোন কোন দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা অপসন্দনীয় যেমন (১) শুধুমাত্র শুক্রবার বা শনিবার দিন বিশেষভাবে রোযা রাখা এবং (২) পারসিক বা অগ্নিপূজকদের ন্যায় 'নিরোয' ও 'মেহেরগান' (ফসলী নববর্ষ)-এর দিন রোযা রাখা (৩) আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ-১৩ যিলহাজ্জ এবং দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ (সূত্র ফিকাহ আহমদীয়া)।

কাদের জন্য রমযানের রোযা ফরয

রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থ ও মুকিম (যিনি বাড়ীতে অবস্থান করছেন এমন) মুসলমান নর ও নারীর জন্যে ফরয বা অবশ্যকরণীয়। মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তিদেরকে এথেকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তবে তারা অন্য সময়ে এদিনগুলোর রোযা পুরো করবেন যে দিনগুলোতে তারা রোযা না রাখার জন্যে অবকাশ পেয়েছেন (সূত্র ঃ সূরা বাকারা ঃ ১৮৬ আয়াত)।

ঋতুবতী এবং সদ্য সন্তান প্রসব করেছেন এমন মহিলারা রোযা পরে পুরো করবেন। গর্ভবতী মহিলারা ভ্রূণের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এবং প্রসূতি বা সন্তানের দুধের অভাবের আশঙ্কায় থেকে যাওয়া রোযা পরে পুরো করবেন। দীর্ঘ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রোযা রাখা সাধ্যাতীত হলে 'ফিদিয়া' দেয়ার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে (২ঃ১৮৫)। ফিদিয়া হলো স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেক রোযার জন্যে একজন অভাবীকে দু'বেলা মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো। নেযামে জামাতের মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করার বিধান রয়েছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে। তবে রোযা রাখাই সর্বোত্তম। কেননা, এতে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে।

রমযানের রোযা এবং এর আশিস

রমযান মাস আশিস ও কল্যাণ নিয়ে এসে থাকে। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা এ মাসেই হয়েছিল। তাই কুরআন করীমে এসেছে–**শাহরু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু হুদাল্লিন্নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম্মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান** অর্থাৎ রমযান মাস হলো সেই মাস যে মাসের প্রসঙ্গে কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে বা যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কুরআন গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে পথপ্রদর্শকস্বরূপ এবং পথপ্রদর্শক ও ফুরকানের (অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারীর) জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও বলেছেন–ইযা জায়া রামাযানু ফুতিহাত আবওয়াবুল জান্নাতি ওয়া গুল্লিক্বাত আবওয়াবুন্নারি ওয়া সুফি দাতিশ্ শায়াত্বিনা অর্থাৎ এ কল্যাণময় মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। শয়তানগুলো শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয় (বুখারী কিতাবুল সাওম, পৃষ্ঠা ২৫৫) অর্থাৎ এ কল্যাণমন্ডিত মাসে আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও করুণা আকর্ষণ করার মৌসুম ও মোক্ষম সময়। এ মাসে এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাতে মানুষ সৎকাজ করতে উৎসাহী হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার ও প্রেরণা লাভ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর শয়তানী শক্তিসমূহ প্রভাব সৃষ্টি করতে তেমন সক্ষম হয় না। নচেৎ শয়তানদেরকে বাহ্যিক ভাবে শৃঙ্খলিত করার কোন অর্থ হয় না এবং বাস্তবে সম্ভবও নয়। যদি তা-ই হয় তাহলে কি রমযান মাসে কোন পাপ সংঘটিত হয় না? আসলে এটা রূপক অর্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। হাদীস থেকে জানা যায়, এ মাসের শেষ দশকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজে বেশি বেশি ইবাদত্ বন্দেগী করতেন, দান সদকা করতেন এবং অন্যান্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন যেন সমস্ত পরিবেশটায় একটি জান্নাতের রূপ পরিগ্রহ করে এবং শয়তানী ক্রিয়া কর্ম কম হতে থাকে।

রোযা কখন রাখতে হবে

পূবেই বলেছি সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যস্তের পূর্বে অর্থাৎ রাত নেমে আসার আগ পর্যন্ত সময়ে রোযা রাখতে হবে। রমযানের রোযা রমযান মাস ভরে রাখতে হবে। রমযানের চাঁদ উঠেছে দেখলে বা উঠেছে বলে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ থেকে ঘোষিত হলে পরের দিন থেকে রোযা রাখতে হবে। কোন কারণে রমযানের চাঁদ দেখা না গেলে বা চাঁদ উঠেছে বলে জানা না গেলে শা'বান মাসের ৩০ দিন হিসেব করে রোযা রাখতে হবে (বুখারী)। রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে এবং সাওয়ালের চাঁদ দেখে রোযা ছাড়তে হবে (বুখারী)। রমযানের চাঁদ দেখার খবর যাচাই করার জন্যে একজন বিশ্বাসযোগ্য ন্যায় বিচারক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। কিন্তু ইফতার ও ঈদুল ফিতরের জন্যে কমপক্ষে সেরূপ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। রেডিওর খবরও বিশ্বাস যোগ্য, তবে শর্ত এই, চাঁদ দেখার স্থান ও খবরের স্থানের দিগন্ত এবং উদয়ের স্থান একই হতে হবে নচেৎ এ খবরের ওপর আমল করা যাবে না। অর্থাৎ দুটি স্থানের দুরত্ব যদি অনেক বেশি হয় যেমন বৃটেন ও বাংলাদেশ তাহলে এ ধরনের খবরের ওপর আমল করা যাবে না (সূত্র ঃ ফেকাহ আহমদীয়া)।

(চলবে)

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মুহাম্মদী নবুওয়তের অফুরন্ত ধারা এবং ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের জয়যাত্রা

সুসভ্য মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে নবুওয়ত ও রিসালাতের যে ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তা সময়ের ক্রমধারায় বিভিন্ন নবী রসূলের আগমনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে হতে সবশেষে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শুভাগমনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্তরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে। মহানবী বিশ্বনবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে নবী আগমনের শেষ ধারায় আবির্ভূত হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবুওয়তের আবির্ভাব হচ্ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর পর এখন আর কোন শরীয়তধারী, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীর আগমন হবে না। কেয়ামতকাল পর্যন্ত কুরআনী শরীয়তই এখন মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান। ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানগণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো জাতির মাঝে ঐশী নেতৃত্বের ধারা বিদ্যমান থাকবে না। মুহাম্মদী নবুওয়তের অফুরান কল্যাণ ধারা প্রবাহমান থাকায় এখন মুসলমানদের মধ্যে খতমে নবুওয়তের মোহর ভেঙ্গে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ধর্মের বাইরে থেকে কোন নবীর আগমন হবে না। বরং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (সাঃ) এর উম্মতের মধ্য থেকেই ইসলামে নেতৃত্বের ধারা বজায় থাকবে। এখন নতুন কোনো শরীয়ত গ্রন্থ কুরআন মজীদের বিদ্যমানতায় নাযিল হবে না। এছাড়া মুহাম্মদী শরীয়তে কোনো রকম পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হবে না। কিয়ামতকাল অবধি ইসলামী নবুওয়ত এবং কুরআনী শরীয়তের কল্যাণ ও আশিষধারা প্রবাহমান থাকবে। আল্লাহর মনোনীতধর্ম ইসলাম সকল নবীগণের প্রচারিত শিক্ষার সমষ্টি। মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাবের পর ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধনের জন্যে এবং মুসলমান জাতিকে আলোকিত পথে পরিচালিত করার জন্যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুবর্তীতায় যুগ ইমামগণ আবির্ভূত হোন। পূর্ববর্তী নবী রসূলদের আগমনের ধারা একেবারে বন্ধ হয়ে ইসলামী পরিমন্ডলে এসে সুনির্দিষ্ট ধারায় মিলিত ও প্রবাহিত হয়েছে। এখন মুহাম্মদী শরীয়তের অনুবর্তিতায় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে আদিষ্ট হয়ে মহানবী (সাঃ) এর অন্তর্ধানের পর তাঁর (সাঃ) অবর্তমানে খোলাফায়ে রাশেদীনগণ তারপর প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ (ধর্ম সংস্কারক) গণ, তারপর প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ (আঃ) এবং তাঁর অবর্তমানে নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ধারায় নির্বাচিত ও মনোনীত খলীফাগণ ঐশী নেতৃত্ব প্রদান করবেন। তাদের দ্বারাই ধর্মের সংস্কার এবং পুনর্জীবনের কাজ সুসম্পন্ন হবে। মূল ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে না চললে মুসলমানরা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না।

কালের গতি প্রবাহে ইসলাম ধর্মে যে বিচলতা সৃষ্টি হয়েছে তা ঐশী নেতৃত্বের ধারাক্রমে আবির্ভূত খোলাফায়ে রাশেদীন, যামানার মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে দূরীভূত করা হবে। তারা ধর্মের সংস্কার সাধন করে সজীবতার উন্মেষ ঘটাবেন এবং মৌলিক ধর্মের আসল সৌন্দর্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে যুগ ইমামগণ সত্য ধর্ম থেকে যারা দূরে সরে পড়েছে তাদেরকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে অগ্রগতির পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। ইমামগণ আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মুমিন মুত্তাকীগণকে সত্য ও সুন্দরের পথে চালিত করেন। এখন ইসলামী জামাত বললে যুগ ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত ঐশী জামাতকে-ই বলা শ্রেয় হবে। আর তার অথরিটি ছাড়া কোনো ব্যক্তি সমাজে-নেতা বলে গণ্য হবে না।

যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের নিমিত্তে এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান বিকাশ ও চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে স্বর্গীয় ঐশী নেতৃত্বের চলমান ধারা বজায় থাকা অপরিহার্য। ঐশী নেতৃত্বের ধারাবাহিক শৃংখলে ইসলাম ধর্মে ধর্ম সংস্কারকগণ আগমন করেছেন। ইসলামের অনুসারীরা সর্বগ্রাসী নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে মূল ধারা থেকে ছিটকে পড়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট কোনো মহামানবই পারে মৌলিক ধর্মে ফিরিয়ে এনে তাদের নৈতিকতার মান সমুন্নত করে শান্তি ও প্রগতির পথে চালিত করতে। নবী করীম (সাঃ) এর অনুবর্তীতায় তাঁর (সাঃ) অনুগত ও আশিষদীপ্ত ইমামগণ ঐশী নির্দেশে মানবজাতির সংশোধন, ধর্মের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের জন্যে দন্ডায়মান হবেন আর তাদের দ্বারাই ধর্মীয় অঙ্গনে এক রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কাজেই ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক ঐশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়।

ঐশী ইমাম আগমনের এই পদ্ধতি এবং তার প্রবাহমান কল্যাণধারা অন্য কোনো ধর্মে চালু নেই। আর এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য, মহানবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব ও মহিমার প্রমাণ বহন করে। কারণ মহানবী (সাঃ)-এর পর অন্য কোনো ধর্মে এখন আর কেউ আবির্ভূত হবে না। এক মাত্র ইসলামেই ঐশী নেয়ামতের এ ধারা আজো বলবৎ রয়েছে। অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী এই দাবী করতে পারে না যে তাদের মধ্যে ঐশী নেতৃত্বের ধারা বজায় রয়েছে। আর এটাই ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মের সংস্কার, সজীবতা, সঞ্জীবন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকেই কোনো সৌভাগ্যবান মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ্ দাঁড় করাবেন। আল্লাহ্ই এই ব্যক্তিকে মুসলমানদের সাথে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় প্রেরণ করবেন। এই কথা বলা জরুরী যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকল্পে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগেই ধারাবাহিক ভাবে মোজাদ্দেদ বা ধর্মসংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের মান্যকারী মু'মিন মুত্তাকিদের ঐশী জামাতে সংঘবদ্ধ করে পরিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত করে পরিচালিত করেছেন। ঐশী নেতৃত্বের কল্যাণ ধারা কেবল ইসলামেই সচল ও সক্রিয় রয়েছে। যুগইমাম বা ঐশী নেতার আবির্ভাব শ্বাশত সত্য ধর্ম জীবন্ত থাকার প্রমাণ বহন করে। যুগইমাম মানবজাতির সংশোধন ও পথ-প্রদর্শন এবং হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী করেন। এক ইমাম বা নেতার অধীনে থেকে মুমিন মুত্তাকীগণকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমাদের সম্মানীত পীর ওলামা মাশায়েখ মোল্লা ধর্মাবলম্বীদের উচিত হবে বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার করে যুগইমামের অধীনে আনুগত্যের শপথে বলীয়ান হয়ে একই ইমামের নেতৃত্বে জামাতবদ্ধ হয়ে চলা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এ কালজয়ী শিক্ষা তাঁর অনুপম আদর্শ তাঁর (সাঃ) কল্যাণ ধারা এখনও বন্ধ হয়নি, বরং প্রবাহমান রয়েছে। মানবজাতির মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই শ্বাশ্বত সত্য ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া অপরিহার্য। ইসলাম জীবন্ত ধর্ম। ইসলামের খোদা জীবন্ত খোদা। তিনি মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন এবং মু'মেন বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। কাজেই মহান আল্লাহ্র সঙ্গে প্রত্যেকেরই সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ়তর করে তার নির্দেশিত পথে চলা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলার আদরনীয় সৃষ্টি অবক্ষয়গ্রস্থ হয়ে ঐশী কোপানলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কী? প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকের কবলে পড়ে মানুষ প্রতিনিয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু অসহায় মানুষ পরিত্রাণের উপায় খোঁজে পাচ্ছে না। অনেকেই নির্বিঘ্নে পাপ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ মিথ্যাচার, ভন্ডামী, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, পরচর্চা-পরনিন্দা, দুর্নীতি, সুদ, খুন, ক্ষমতার অপব্যবহার অবলীলাক্রমে করে চলছে। লোকজন যা খুশী তাই করে চলছে। পরকালের শাস্তির ভয় যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। আসলে মানুষ যখনই চরম অধঃপতনের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে তখনই মহান আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর মনোনীত কোনো পুণ্যবান ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ঐশী শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করেন। বর্তমান যুগেও এক মহামানব ঐশী আদেশে যথা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাকে বরণ করে নিতে হবে।

কুরআন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতাকল্পে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে ঐশী ইমামতের ধারাক্রমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হিসাবে আগমন করেছেন। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে যামানার মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহ হিসাবে দাবী করেন নি। কাজেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া খেলাফতের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে আলোকিত পথে সকলের চলা উচিত।

অবক্ষয় প্রাপ্ত এ অধঃপতিত মানুষকে সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত হয়ে ঐশী জামাতে শামিল হওয়া অপরিহার্য। মুসলমান জাতি আজ অধঃপতনের চরম স্তরে উপনীত হয়ে ধ্বংস ও পতনের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ঐশী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে অবশ্যই তাদের ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই ইলাহী জামাতেই আধ্যাত্মিক শান্তি স্বস্তি ও কল্যাণ ও নেয়ামতের ধারা প্রবাহমান রয়েছে। এই জামাতে নবুওয়তের পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাফতের ধারা চলছে।

যদি এমন হতো পীর, ওলামা মাশায়েখ ও মুফতীর নেতৃত্ব সবাই মেনে নিত। আর তারাই হত ধর্মের কান্ডারী। তাহলে

পাক্ষিক আহমদী # ২৮

নেতৃত্বের প্রশ্নেও মুসলিম জাহান নানা বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ত। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই নায়েবে রসূল হওয়ার তথাকথিত দাবীদার আলেম ওলামাদের নেতৃত্বে মুসলমানজাতিকে পরিচালিত হওয়ার জন্য ঐশী নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাহলে ঐশী নেতৃত্বের বিদ্যমানতায় দ্বৈত নেতৃত্বকে খোদাভীরু মু'মিন মুত্তাকীগণ মেনে নিবে কী? আলেম ওলামাদের মধ্যেও মতপার্থক্য ও মতভেদ রয়েছে। আর এজন্যই ঐশী ইমামতের ধারা ইসলামে সচল রয়েছে। নতুবা পীর, ওলামা মাশায়েখগণ ইসলামকে খন্ড-বিখন্ড করে মুসলিম জাহানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠত। ধর্ম হয়ে উঠত অবৈধ অর্থ উপার্জনের চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তাআলা তার হেফাযত এবং ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য ব্যবস্থা জারী রেখেছেন। মুসলিম ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার জন্যে বিশ্ব পরিমন্ডলে নবুওয়তের পদ্ধতিতে ঐশী খেলাফতের কল্যাণকর ধারা চালু রেখেছেন।

মুসলমান জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু গর্ব ও অহংকারে স্ফীত হয়ে এই জাতি বিশ্বে নৈতিক চারিত্রিক উৎকর্ষতার মানদন্ডে কোথায় অবস্থান করছে তা চিন্তা ভাবনা করে দেখা দরকার। সমাজের বাইরের এবং ভিতরকার অবস্থা কীরূপ তা তলিয়ে দেখা দরকার। বিশ্বে অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা কী রকম তা সবার জনা। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, বাদশাহাত, স্বৈরতন্ত্র, সামরিক ও নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন হওয়ায় মুসলিম রাষ্টগুলোতে শান্তি নাই বললেই চলে। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশ্ব-মোড়ল ও পরাশক্তির মদদ পুষ্ট সরকারগুলো শান্তি স্থাপনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

মুসলমান জাতি আজ নানান অপকর্মের ফলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার আসন থেকে ছিটকে পড়ে ঐশী রোগপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে পড়েছে। পূর্ণতা প্রাপ্ত ধর্ম ও শরীয়তের অনুসারী মুহাম্মদী উম্মত অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আজ ইসলামের পরিমন্ডল থেকে দুরে সরে পড়েছে। সামাজিক পরিমন্ডলে যারা আলো ছড়াবে আজ তারাই অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদকে সমুলে উচ্ছেদ করে যারা বিশ্বময় শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে তারাই আজ ধর্ম ও রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজ বিরোধিরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, ভূমি দখল, সাম্প্রদায়িকতা, অপশাসন, অবিচার, দূর্নীতি, চাঁদাবাজি, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, ঘুষ, মিথ্যাচার, গিবত, ব্যভিচার, বেদাত অবিরত ধারায় করে চলছে। এইসব সমাজ বিরোধী জঘন্য অপকর্মের সঙ্গে কারা জড়িত, তাদের ধর্মীয় পরিচয় কী-তা সবার জানা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা সেই সকল মানবতা বিধ্বংসী জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ায় মানব সমাজে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তথাপি প্রশ্ন হচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়গ্রস্থ মুসলমানদের কে দিবে সঠিক পথের দিশা? কে তাদের রক্ষা করবে? সর্বগ্রাসী পতনকে কে ঠেকাবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত কোন মহামানবই মুসলমানদের বাঁচাতে পারে। শ্রেষ্ঠনবীর উম্মত তাদের কৃত অপকর্মের জন্য ঐশী শাস্তির কবলে পড়তে পারে বলেই তাদের সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে ঐশী নেতৃত্বের ধারাক্রমে হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর অনুবর্তীতায় প্রেরণ করেছেন ভারতের কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্যে তাঁর প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করে ঐশী ইমাম হিসাবে দন্ডায়মান হয়েছেন তিনি।

বলা আবশ্যক যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এইজন্য প্রেরণ করেছেন যে তাঁর মাধ্যমে যেন সমগ্র মানবজাতি একই প্রেমের মোহনায় মিলিত হয়। সবাই যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর আশীষদীপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে মহানব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঐশী নেতৃত্বের জামাতভুক্ত হয়। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরও ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারতার কাজ খোলাফায়ে রাশেদীন, মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদের নেতৃত্বে চলে আসছে।

হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর অবর্তমানে তাঁর জামাতে রসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত বা নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা চলছে (আহমদ বায়হাকী)। এই জামাতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় পঞ্চম খেলাফত কাল চলছে। বর্তমানে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের নন্দিত ইমাম বা নেতা। মু'মিনদের জামাতের আমিরুল মুমিনীন'

বা মহান খলীফার আসন বিশ্বময় পরিব্যপ্ত। খলীফার আসন বিশ্ব চরাচরে বসবাসকারী সকল মু'মিন মুত্তাকীর জামাতে পরিব্যপ্ত রয়েছে। মু'মিনের হৃদয়-মনে খলীফার আসন। কাজেই তিনি যুগ ইমাম এবং তাঁর অথরটি ও অনুমোদন ছাড়া কোন ইমাম বা নেতা নাই। আহমদীয়া মুসলমানরা এক খলীফা বা ইমামের অধীনে জামাতবদ্ধ হয়ে চলছে। এই জামাতে শিক্ষা ও চরিত্রগঠনমূলক (তালিম তরবিয়ত) কার্যক্রম যুগ খলীফার নেতৃত্বে সুবিন্যস্ত ধারায় চলছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার আনুগত্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ইমামত বা নেতৃত্ব বজায় রয়েছে। তারা সমাজে যেমন ইমাম তেমনি মসজিদেও ইমাম বটে। মুরব্বী মোয়াল্লেমগণও ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একতার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা অন্যায়। মূল নেতৃত্ব একটি সুবিন্যস্ত ধারায় চলছে। কাজেই এই জামাতে নেতৃত্ব, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশে এবং যুগ খলীফার আনুগত্যে, বিদ্যমান রয়েছে।

এটি খোদা তাআলার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ, কাজেই এই বৃক্ষকে যারা কর্তন করতে উদ্যত হবে তারাই অপমান অপদস্ত হয়ে লানতি মৃত্যুবরণ করবে। যে তার মসীহকে অপমান করবে আল্লাহ্ তাদের অপমানিত করবেন। অতীতে কয়েকজন শাসক যেমন ভূট্টো, ফয়সাল, জিয়াউল হক, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়ে ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। এই জামানায় ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে একটি স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে। আর এটিই আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে পরিচিত। বর্তমানে প্রায় ১৮৮টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জীবন্ত ধর্ম ইসলামে একটি নেযামে জামাতে ঐশী নেতৃত্বের ধারা চালু রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। ঐশী জামাতে যুগখলীফার মাধ্যমে জামাতের কার্যক্রম সচল ও সক্রিয় থাকে। আর এটিই ইসলামী নেযামের মৌলিক ধারা। যেটি হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর নির্দেশিত পথে চলে বিশ্বে আলো বিকির্ণ করে চলেছে। আখেরী যামানায় সকল সত্যাশ্রয়ীদের এই ঐশী জামাতে-আহমদীয়া মুসলিম জামাতে শামিল হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। মানব রচিত পার্থিব সকল সংগঠনের বিপরীত পন্থায় ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য ও পায়রবীর ফলশ্রুতিতে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। ইসলামের নবী (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে ধ্বংস ও পতন থেকে বাঁচাবার জন্য একজন প্রতিশ্রুত মসীহ্ এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আর এই ঈসা ইবনে মরিয়ম বা মসীহ্ মুসলমানদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনি ঐশী আদেশে মসীহ্ হওয়ার দাবী করবেন। আসলে যিনি ইমাম মাহদী হিসাবে আসবেন-তিনি একাধারে মুহাম্মদী মসীহ্ নামেও আখ্যায়িত হবেন। এছাড়া তিনি আখেরী যামানার মুজাদ্দিদে আযমও হবেন।

প্রতিশ্রুত এই যুগ ইমাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, **'কি করে ধ্বংস হবে আমার উম্মত যার প্রথমদিকে আমি রয়েছি এবং শেষ দিকে মসীহ্ রয়েছেন'**। (মেশকাত)

মুসলিম জাহান আজ গভীর সংকটে নিপতিত। এই সংকট থেকে উত্তরণ করতে হলে মুসলিম মিল্লাতের মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ও উপায় নাই। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এই যামানায় কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে মুসলিম জাহানের ইমাম বা নেতা হিসাবে মেনে নেওয়া উচিত। কারণ ঐশী ইমামের আনুগত্য ছাড়া রূহানী উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন হয় না।

আখেরী যামানার যুগ ইমাম হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর প্রতিনিধি এবং 'উম্মতী নবী' হিসাবে আলেম ওলামা মাশায়েখ ও পীরদের মাঝে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তুলে ধরবেন। তিনি তাদের মাঝে 'উম্মতী নবী' হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্দার সম্পর্কের মাঝে সকল জটিলতা দূর করে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যম ব্যতিরেকে খোদা তাআলার ভালবাসা, সান্নিধ্য ও অনুকম্পা লাভ সম্ভব নয়। তাই এই মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যই ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তার খলীফাগণ উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে জাচ্ছেন। এই কল্যাণকর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খিলাফতের রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে ধরতে হবে। জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিশ্ব বিজয়াভিযানে সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়া সময়ের অনিবার্য দাবী। এ দাবী পূরণার্থে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কাম্য, বিরোধিতা নয়।

আমীর মাহমুদ ভূইয়া

খেলাফতে আহমদীয়া
মুহাম্মদীয় নবুয়তের দ্বিতীয় বিকাশ

মোহাম্মদীয় নবুয়তের উম্মতে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লা-হর খলিফা। এখন আলেমকুলের প্রশ্ন-তিনি কি হবেন? তার পরিষ্কার জবাব-কুরআন মজীদের ভাষায় "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরজে খলীফা"-নির্দেশে আল্লা-হ রাহমানুর রাহীম হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে যে খিলাফত শুরু করেছিলেন, উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে দিয়ে ঠিক তেমনটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) শতাব্দীর শিরোভাগে (চর্তুদশ শতাব্দীতে) আবির্ভূত হয়ে ধর্মকে সঞ্জীবিত করার এবং কুরআনের হেফাজত কারী ও মোহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নতকে পৃথিবীর বুকে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। তিনি মোহাম্মদী নবুয়তে ইমাম মাহদী, তিনি মোজাদ্দেদে আযম, তিনি আল-হ্ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিত্ব। তিনি সপ্তম হাজার বছরের শেষ আদম। এ যাবত ছয় আদমের কাল বা সময় পেরিয়ে গেছে। আখেরী হাজার বছরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) মুমেনদের ইমাম- যে মুমেনের ব্যাখ্যা কুরআন মজিদে সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি কোন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইমাম মাহদী হিসাবে দাবী করেননি, তিনি মুমেনদেরকে ভ্রান্তি থেকে তুলে প্রকৃত মুমেন বানানোর জন্য এ উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'বুরুজ' (প্রতিবিম্ব) হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আগমন ও দাবী উভয়ই 'খাতামান্নাবীঈন' গুনের তাজাল্লি-তে (জ্যোতিতে) ভরপুর। তাঁর (হযরত ইমাম মাহদী) প্রতিষ্ঠিত জামাত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত; তাঁর জামাত পূণ্যবানদের জামাত, তাঁর জামাতের সদস্যগণ সাহাবায়ে কেরাম রেজুয়ানে আলাইহিমের চলা পথে ঈমান-আমল, যুক্তি ও নিদর্শন নিয়ে সারাবিশ্বে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত। আজ একমাত্র তাঁর জামাতের সদস্যগনই এ ভোগ-বিলাস আর অবক্ষয়ের যুগে ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করছে। তাই তারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েও বিদ্রোহ করে না, দেশের সমাজ ব্যবস্থায় অশান্তি ও কলহ ছড়ায় না। তাঁর অনুসারীরা পৃথিবীর সব দেশেই সবরকারী শান্তিপ্রিয় আর আল্লা-হর দরবারে মানুষের জন্য দোয়াকারী জামাত হিসাবে পরিচিত।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আল-হর নির্দেশে মুহাম্মদীয় উম্মতে ইমাম মাহদী (আঃ) হিসাবে নিজকে দাবী করার পূর্বে ও পরে ৮৮ (আটাশি) টি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে খ্রীষ্টান, আর্য সমাজীসহ তদানীন্তন ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলা করেছেন। তার ক্ষুরধার লেখনী ইসলামকে সব ধর্মের মোকাবেলায় এক অপূর্ব বিজয়দান করেছে। তিনি তাঁর কিতাব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' এ লিখেছেন- "এ অধমকে তো এ উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে যে, সে যেন আল্লা-হর সৃষ্টির কাছে এ বানী পৌঁছায় যে, দুনিয়ার বুকে আজ যে সকল ধর্ম বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে সেই ধর্মই সত্যের উপরে আছে এবং খোদা তাআলার ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যমান রয়েছে, যা কুরআন করীম নিয়ে এসেছে। এবং পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র দরজা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্ল-হ'। তিনি (আঃ) তাঁর 'লেকচার লাহোর' এ লিখেন- "সর্বোপরি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব হৃদয়ে পুনরায় আল্ল-হ তাআলার সেই খাঁটি ও উজ্জল তৌহীদের প্রতিষ্ঠা করা-যা মানব পূজার বা পৌত্তলিকতার সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত এবং যা এখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এসব কাজ আমার শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হবে না বরং তাঁরই শক্তির দ্বারা হবে যিনি আসমান ও যমীনের খোদা।"

প্রিয় পাঠক! এ যাবত তাঁর পরিচিতি তুলে ধরলাম যিনি 'খেলাফত আলা মিনহাযেন্ নবুয়তে'র পুরোধা। তিনি ১৮৯১ সনে মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) হিসাবে দাবী করেন এবং ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর কায়েম হয় 'খিলাফত আলা মিনহাযেন নবুয়ত' বা খলিফাতাল্ল-হিল মাহদীয়া (আহমদ, বয়হাকী, ইবনে মাজা)-যা' কেয়ামত পর্যন্ত চলবে।

আমরা যদি আলোচনার শুরুতে আবার ফিরে যাই তাহলে দেখা যাবে সর্বশেষ তুরস্কে নামসর্বস্ব যে খেলাফত ছিল, তাও ১৯০৮ সনে তুরস্কের দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের পদচ্যুতিতে অবসান হলো। কিন্তু আল-হ রাব্বুল আলামীন, যিনি মুমেনদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য 'কুরআন' এর মত এক পূর্ন জীবনবিধান নাযেল করেছেন, নবীসম্রাট খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ আরাবী (সাঃ) এর মাধ্যমে এ জীবনবিধান কুরআন-এর হেফাযতের বিষয়টাও রেখেছেন নিজের কাছে এবং তাঁর (আল্ল-হর) একত্ববাদ প্রচারের জন্য কুরআনে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার যে অঙ্গীকার করেছেন তাঁর মুমেন বান্দাদের সাথে, তুরস্কের সুলতানের পতনের মধ্য দিয়ে নামমাত্র সে খেলাফতেরও অবসান ঘটে, তাতে আল্ল-হ রাহমানুর রহিম নীরব হয়ে যাননি। আল্ল-হ তার কুদরত ও রহমতের বারিধারা বর্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য এবং মুমেন বান্দাদের সাথে সূরা নূর এ বর্ণিত তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে ১৯০৮

সনেই মোহাম্মদীয় নবুয়তে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের মাধ্যমে 'খেলাফত আলা মিনহাযেন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে প্রমানিত হয়েছে- তিনি (আল্ল-াহ) কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

যে খেলাফতে ইসলাম পুণঃ জীবন লাভ করবে, বিশ্বে উম্মতে ওয়াহেদা প্রতিষ্ঠিত হবে, বর্তমান বিশ্বের মুসলিম আলেমকুল সে খেলাফতের প্রতি উদাসীন। বরঞ্চ তারা কোন কোন দেশে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তের মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে-দোহাই দিয়ে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করছে।

সুধী পাঠকদেরকে এতক্ষণ যে বর্ণনা দেয়া হলো তাতে কি কোথাও কোনভাবে বা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর কার্যাবলী কোন কুফরী বা ইসলাম ধর্মের ক্ষতিকারক বা হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্ল-াহে (সাঃ) এর 'খাতামান্নাবীঈন' মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে? তাহলে কোন অধিকারে আমাদের সমাজের ধর্মবেত্তা আলেমকুল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে নবুয়ত না মানার ভ্রান্ত ধারনায় কুফরী ফতোয়া দিয়ে রেখেছে? তাদের এহেন কার্য কি কুরআন বা সুন্নাহ মোতাবেক? তিনি তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত বলেই ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ। ভারতবর্ষে, যেখানে মুর্তিপূজক, অগ্নিউপাসক, খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের অর্থাৎ সর্বধর্মের মানুষের আবাসভূমি, সে মাটিতে আল-াহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদীয় নবুয়তে 'সূরা নূরের' প্রতিশ্রুতি পূর্ন করে 'খেলাফত আলা মিনহাযে নবুয়ত' কায়েম করলেন ঈমানদার ও মুমেনদের মাঝে। উলামাকুল এ খেলাফত প্রতিষ্ঠায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না-বরঞ্চ তারা মেতে উঠলেন মীর্যা সাহেবের ইমাম মাহদীর (আঃ) দাবীতে কুফরী ফতোয়া দিতে। কেউ বা তার মৃত্যুকে অপবাদ দিয়ে উল্ল-সিত হলেন। কেউবা আহরারীদের সাথে হাত মিলালেন, কেউ বা তাঁর দাবীকে (মীর্যা সাহেবের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে সাধারণ মানুষগুলো-কে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করার কাজে পড়ে রইলেন। আর এ সুযোগ ব্যবহার করলেন ভারতবর্ষের মাটিতে খ্রীষ্টান পাদরী আর হিন্দু পন্ডিতেরা। ভারতবর্ষের হিন্দু পন্ডিতেরা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার ফায়দা লুটে নিলেন। আলেমকুল এসব অনৈসলামিক ও অহেতুক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে খেলাফতের ঐশী আশীষ থেকে বঞ্চিত রইলেন। দর্জি, হাযাম, গৃহনির্মান কারীদেরকে 'খলীফা' নামটি দিয়ে এর অবমাননা করলেন।

শেষ যুগের এ খেলাফতও খেলাফতে রাশেদার মত বিরোধীতার সম্মুখীন হলো। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হযরত আলহাজ্জ হাকীম নূরুদ্দিন (রাঃ) খেলাফত প্রতিষ্ঠান রক্ষায় সাহসী ও বীরোচিত পদক্ষেপ গ্রহন করেন এবং খেলাফতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখেন। তিনি জামাত ও তার বাইরের মুসলমানদের মাঝে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষনা করেন-"কাউকে খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয়, বরং এটা মহাপরাক্রমশালী আল্ল-াহতায়ালার কাজ।" তিনি আরো বলেন "আমি খলীফাতুল মসীহ এবং খোদা আমাকে এ পদে অভিষিক্ত করেছেন। এখন তোমরা কেউ আমাকে সরাতে পারবে না-বা আমাকে সরানো তোমাদের কারো ক্ষমতাও নেই।" মানুষ মরনশীল, তাই ইমাম মাহদী (আঃ)ও অমর ছিলেন না- একই পথে তৎপরবর্তী খলীফাগণও অমর হননি। সে পথ ধরেই ১৯১৪ সালে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)।

খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদতের পর মুসলমানরা হারিয়ে ফেলেন অগ্রগতির পথ। হযরত উমর (রাঃ) এর নেতৃত্বে যে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল দুনিয়ার বহু দেশে- নেতা ও সংগঠনের অভাবে তারা হয়ে পড়ে দুর্বল। এমনকি ইউরোপের কতিপয় দেশের মুসলমানরা খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী শাসকদের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হয়ে যান।

সর্বশক্তিমান আল্ল-াহ পাকের পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাউওদ ও ইমাম মাহদীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী গ্রহন করেন। দেশে দেশে মুবাল্লে গ (ইসলাম ধর্ম প্রচারক) পাঠিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে খন্ডন এবং খ্রীষ্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে আল্ল-াহর বান্দাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনার ব্যবস্থা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তালীমুল ইসলাম স্কুল/ কলেজে উপযুক্ত কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিয়ে মুবালে-গ তৈরী করার কাজটি যেমন শক্তিশালী করেন, তেমনি ইসলামে পুণঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথা 'বায়তুল মাল' ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেন। বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। জামাতের সদস্যগনকে উদ্বুদ্ধ করেন খাওয়া পরার ব্যাপারে সাদা সিধা জীবন যাপনে। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পরে নবুয়তের ধারায় যে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার শীর্ষে খলীফা অর্থাৎ আমীরুল মুমেনীন। তাঁর পরামর্শের জন্য রয়েছে মজলিসে শূরা। সারা পৃথিবীর, প্রত্যক দেশের আমীরগণ এ 'মজলিশ-এ-শূরার' সদস্য। এ শূরা বিভিন্ন বিষয়ে জামাত পরিচালনায় যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নের প্ল-াটফর্ম। এ শূরার অধীনে রয়েছে মজলিশে ইন্তেখাব তথা Electoral College বা খলীফা নির্বাচকমন্ডলী। খলিফার ইন্তেকালের পর, এ নির্বাচকমন্ডলী একত্রিত হয়ে দোয়া, দরুদ ও ইস্তেগফার করে খলীফা নির্বাচন করেন প্রকাশ্যে। নবনির্বাচিত খলীফা

জামাতের সকল সদস্যের 'বয়াত' নেন এবং পরলোকবাসী খলীফার নামাযে জানাযা পড়ান ও সমাহিত করেন।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) ইসলামী খেলাফতের কর্মকান্ডকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সংগঠন সমূহ কায়েম করে গেছেন।

কেন্দ্রীয় মজলিসে মুশাবেরাতঃ (মজলিসে শুরা)।

নেযামে বায়তুল মালঃ যাকাত ও 'ওয়ামিম্মা রাযাকনাহুম' এর ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক ১/১৬ হারে চাঁদা ও অন্যান্য কার্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ব্যয় ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

নেযামে ওসীয়্যতঃ যে সব সদস্য আল-ওসীয়্যত কিতাবে ঘোষিত ব্যবস্থানুযায়ী সারা বিশ্বে এক স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ইসলামী অর্থনেতিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে নিজ আয়ের ও সম্পত্তির ১/১০ থেকে ১/৩ ভাগ পর্যন্ত দানের ওসীয়্যত করেন তার ব্যবস্থাপনা এবং 'বেহেশতী মকবেরা' বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।

কাযা বোর্ডঃ বিচার ও সালিশ বিভাগ।

দারুল ইফতাঃ ফতোয়া বিভাগ।

মজলিসে আনসারুল্লা্হঃ চল্লি-শোর্ধ পুরুষদের অভ্যন্তরীন সংগঠন।

লাজনা ইমাইল্লা্হঃ মহিলাদের সংগঠন

নাসেরাতুল আহমদীয়াঃ বালিকা-কিশোরীদের সংগঠন।

খোদ্দামুল আহমদীয়াঃ যুবকদের সংগঠন।

আতফালুল আহমদীয়াঃ বালকদের সংগঠন।

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানঃ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার।

ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানঃ অভ্যন্তরীন প্রচার ও মুয়াল্লি-ম (শিক্ষক) প্রশিক্ষণ কর্মসুচী।

ইশায়াত বিভাগঃ ধর্মীয় কিতাবাদি প্রনয়ন ও প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা, প্রদর্শনী ও পাঠাগার।

পরবর্তী খলিফাগণ নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাপনা গুলো জারী করেছেনঃ

নেযামে ওয়াকফে নওঃ ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই পিতামাতারা তাদের সন্তানদের উৎসর্গ করেন। জীবন উৎসর্গকারী এ শিশুদের তালীম তরবীয়ত এবং তাদের পিতা-মাতার তরবীয়তও এর ব্যবস্থাধীন।

নও মুবা'ঈনঃ নতুন বয়েত কারীদের তালীম তরবীয়তের ব্যবস্থা।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টান্যাশনালঃ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে উভয় গোলার্ধে ইসলাম প্রচারের সকল কার্যক্রম দিন রাত আটটি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

এছাড়াও এ খেলাফতের অধীনে জামাতের সদস্যগনের তালীম-তরবীয়ত, স্বাস্থ্য (চিকিৎসা কেন্দ্র-হাসপাতাল), কৃষি, ব্যবসা, বিবাহ-শাদী, বৈদেশিক সর্ম্পক, জন সংযোগ ছাড়াও স্কুল-কলেজ/মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। তা'ছাড়া কেন্দ্রে আগত মেহমানদের থাকা খাওয়ার ব্যাপার তো রয়েছেই। বয়াত এ খেলাফতের তত্বাবধানে ৫৭টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের ১৮৯ টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে বহু মসজিদ এবং আরও বিভিন্ন দেশে মসজিদ নির্মানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল নির্মাণ করে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ শিক্ষার জন্য।

আজ বিশ্বের বহুদেশে ইমাম মাহদী (আঃ) এর খেলাফতের কার্যক্রম প্রমাণ করেছে যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে রাষ্ট্রশক্তি বা অস্ত্রের প্রয়োজন নেই-এমন কি খেলাফতের সাথে রাষ্ট্রশাসনের কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। হযরত রাসুলুল-হ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করে আজ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাত সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও খলিফার তত্বাবধানে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত। অপরদিকে একদল বিভ্রান্ত, অজ্ঞ মুসলিম নামধারী উলামা এ জামাতের বিরোধীতা করে কোন কোন দেশে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করছে। অথচ এরা খেলাফতের অস্তিত্ব কার্যক্রম সম্পর্কে উদাসীন থেকেও নিজেদেরকে নায়েবে রাসুল বলে মনে করে। 'খেলাফত' ইসলামের বৈধ ব্যবস্থাপনা- খলীফা ইসলামের কান্ডারী ও খোদার প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্ব-এ বিষয়ে উলামাকুলের কোন দায়িত্ব নেই। এ উলামাকূল যার যার মতাদর্শ নিয়ে ব্যস্ত। এহেন কার্যক্রম, নীরবতা কি ইসলামের উন্নতি ও যথাযথ নেতৃত্বে অন্তরায় নয়? পাঠক! আমার তো মনে হয়, এ চরম অজ্ঞতা কুরআনী শিক্ষা থেকে মারাত্মক বিচ্যুতি । এত সব কর্মকান্ডের পরও আমাদের উলামাকুলের কাছে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। তারা হযরত ইমাম মাহদী হিসাবে ভারতবর্ষের হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কেন দাবী করলেন, কেন তার জন্ম কোন আরবদেশে হয়নি, তিনি কি নবী দাবী করেছেন-এসব বিষয় নিয়ে বিতন্ডা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করছেন। এদিকে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পর ইসলামে তথা উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে যে 'খেলাফত আলা মিনহাযে নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-ইনশাআল-হ আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৮ সনে এ খেলাফতের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ও পঞ্চম খলীফা সৈয়দেনা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদের (আইঃ) নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কৃতজ্ঞচিত্তে ইসলামী খেলাফতের শত বার্ষিকী উদযাপন করবে।

পরিশেষে, পাঠকদেরকে-যারা আজো ইসলামের চলমান খেলাফতের ছায়াতলে আসার বিষয়টাকে নিয়ে ভাবেন নি তাদেরকে আমার সবিনয় অনুরোধ-এ খেলাফত উম্মতে ওয়াহেদার প-টফর্ম, কুরআন সম্মত ইসলামের নেতৃত্ব এবং এ আল-হ্র প্রতিশ্রুত খেলাফত, মুসলমানদের জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় নেয়ামত- আপনিও এ নেয়ামতের ভাগী হউন।

আলহাজ্জ্ব এ.কে. রেজাউল করীম

উকিলে আ'লার দপ্তর থেকে

(১)

আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্ল-াহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত ১৫ জুন, ২০০৭ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে তাঁর জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

পূর্বের খুতবার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায়, হুযূর (আইঃ) বলেন, সুদ সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাই আল্লাহ্ তাআলা সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং যারা সুদ খায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যে ব্যবসায়ীক লেনদেনে সুদ দেওয়া-নেওয়া হয় তার পরিণতি খুব মারাত্মক হতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিত্তশালী ব্যক্তিরাও দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলেই এমন হয়ে থাকে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, কেউ কেউ লন্ডনে জলসায় আসার জন্য সুদে টাকা ধার নেয়। এটা খুবই খারাপ। যাদের সামর্থ আছে তারা আসতে পারেন। কিন্তু ঋণ করে জলসায় আসার কোন যৌক্তিকতা নেই। সুদের উপর ঋণ নেওয়ার ফলে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ্ তাকে সুদের অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন। মনে রেখো, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির মতই সুদ নেওয়া ও দেওয়াও এক পাপ।

হুযূর (আইঃ) বলেন, 'অনেকে এ শর্তের উপর অন্যদের টাকা ধার দিয়ে থাকেন যে, তারা প্রতি বছরে অথবা প্রতি ছয় মাসে একটি নির্ধারিত পরিমাণ মুনাফা লাভ করবেন। এটাও এক ধরনের সুদ এটা ব্যবসা নয়। বরং এটা ব্যবসার নামে প্রতারণা বিশেষ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেছেন যে, যখন কেউ কাউকে টাকা ধার দিয়ে বিনিময়ে পণ্য বা মুনাফা বা লভ্যাংশ নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়, সেই নির্ধারিত মুনাফা বা লভ্যাংশকেই সুদ বলে। হুযূর (আইঃ) বলেন, এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এমন সব লেন-দেনকেই সুদ বলা হবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, ইসলাম চায় ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটাতে। আর এ ভ্রাতৃত্ব তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন মানুষ দরিদ্রদের দিকে দৃষ্টি রাখে। যদি আপনারা আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগী হতে চান, আপনাদের গরীব ভাইদের সাথে দয়াশীল হোন এবং তাদের উপকার করার চেষ্টা করুন। সুদের নিষেধাজ্ঞার প্রতি আহমদীদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আমাদের ব্যবসায়িক লেন-দেনে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিম্নোক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। কারণ আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। এ নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম প্রকৃতই একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেন আর ঋণের বিষয় লিখে রাখবে। ঋণের পরিশোধের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে যাতে ঋণ গ্রহীতা সচেতন থাকতে পারেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণদাতাকে যেন ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে বার বার বিরক্ত করতে না হয়। উভয়ের হৃদয়েই আল্লাহ্‌র ভয় রাখতে হবে। এভাবে কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে আমরা পৃথিবীতে শান্তি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, প্রতারণা ও মিথ্যার মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি দখল করবে না। নিজের লাভের জন্য ঘুষ প্রদান করবে না। অন্যের সম্পদের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাবে না। কারণ এর ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যারা অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে তাদের ঘরে সুখ-শান্তি থাকে না। আহমদীদের এসব নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তারা যেন তাদের পারিবারিক সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত না হয়।

আল্লাহ্ তাআলা আহমদী মুসলমানদের এসব পাপকর্ম থেকে রক্ষা করুন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পছন্দনীয় পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অনুগ্রহ পূর্বক হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত উপরের দিক নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

জাযাকুমুল্ল-াহ।

ওয়াস্‌সালাম
চৌধুরী হামিদুল্ল-াহ
উকিল আ'লা
তাহরীকে জাদীদ
আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান
তারিখঃ ২১ জুন, ২০০৭

(২)

আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্ল-াহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত ২২ জুন, ২০০৭ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে তাঁর জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাক্ওয়া হলো একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সকল আহকাম মেনে চলা সম্ভব। কেউ যখন তাক্ওয়ার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে নিজের মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনের সকল আহকামের মধ্যে যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো তাক্ওয়া এবং সৎপথ অবলম্বন। তাকওয়া পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করে এবং সৎকর্মের প্রেরণা যোগায়। তাক্ওয়ার উপর এত জোর দেওয়ার কারণ তাক্ওয়াই শান্তির মূলমন্ত্র। তাকওয়াই হচ্ছে সে দূর্গ যা সবরকম অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করে। সুতরাং তাকওয়া হলো সেই ভিত্তি যার উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (৪৯ঃ১৪)

সুতরাং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদন্ড হলো তাকওয়া। একমাত্র তিনিই (আল্লাহ্) জানেন, কে তাকওয়ার দিক থেকে উত্তম। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র মানবজাতি এক পরিবার। আমরা যদি মিলেমিশে এক হয়ে বসবাস করতে পারি তবেই আমরা একে অপরের জন্য শান্তি নিশ্চিত করতে পারব। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনে এ শিক্ষা বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। বিদায় হজ্জ উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান। অনারবিয়র উপর আরবিয়র কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই এবং আরবিয়র উপরও অনারবিয়র কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তোমাদের গায়ের রং বা তোমাদের বংশ গৌরব তোমাদের জন্য সম্মানের উৎস নয়।"

আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা (কাফেররা) যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না। তাহলে তারাও বিদ্বেষবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্কে গালি দিবে।" প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এতটা ভদ্রতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্) মূর্তি-পূজকদের মূর্তিকেও গালি দিতে নিষেধ করেছেন। এমনকি যদিও এ মূর্তিগুলি তাঁর (আল্লাহ্র) শিক্ষানুযায়ী মূল্যহীন তথাপি আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে তাদের জিহ্বাকে সম্বরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভালবাসা ও দয়ার সাথে বোঝাতে বলেছেন। এগুলি হলো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র দেওয়া শিক্ষা। আজ এ শান্তির শিক্ষা প্রচার করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ আপনাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করা। যাতে সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দরূদ প্রেরণ করুন এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রকৃত নমুনাস্বরূপ নিজেদের পেশ করুন। বর্তমানে আহমদীরাই কেবল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার চিত্র প্রদর্শন করতে পারে। এ বিষয়ে আরও সচেষ্ট হওয়া প্রতিটি আহমদীর কর্তব্য।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে 'শান্তি' সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ আমাদের ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে ও ন্যায় আচরণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ ইনসাফই তাক্ওয়ার নিকটবর্তী। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেন, তোমাদের প্রতি কারও শত্রুতার কারণে তোমরা তার প্রতি ইনসাফের পরিপন্থি আচরণ করো না। সন্দেহ নাই যে, শত্রুরা যারা মক্কার কাফেরদের মতো তোমাদেরকে এত দুঃখ কষ্ট দেয় তাদের প্রতি ইনসাফ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় শত্রুকেও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করতে। যে ব্যক্তি তার চরম শত্রুর প্রতি ইনসাফ করতে পারে প্রকৃতপক্ষে সে-ই পারে তাকে ভালবাসতে। এটাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

অবশেষে হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের শীঘ্রই সেদিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন যখন পৃথিবীতে দেশে দেশে এমন সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্রতিটি আহমদীকে অবশ্যই দোয়ায় মনোনিবেশ করতে হবে এবং পৃথিবীকে ভালবাসা ও শান্তির আবাসে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অনুগ্রহ পূর্বক হুযূর (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত এই দিক নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

জাযাকুমুল্লাহ।

ওয়াস্সালাম

চৌধুরী হামিদুল্লাহ

উকিল আ'লা

তাহরীকে জাদীদ

আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান

তারিখঃ ২৮ জুন, ২০০৭

অনুবাদক–**বশীর উদ্দীন আহমদ**

জামাত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

গাজীপুর জামাতে তবলীগি সেমিনার

গত ২৯ জুন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুরস্থ মসজিদে বাদ জুমআ একটি তবলীগি সেমিনার অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত তবলিগী সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব। সেমিনারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি ও প্রশ্ন উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৫ জন জেরে তবলীগসহ ৬৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ২ জন বয়াত গ্রহণ করেছেন।

জনাব কবির আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন

গত ৩ আগষ্ট শুক্রবার বাদ জুমআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস ও নযম পাঠের পর খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, ও খলীফা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত হন, খেলাফত শত বার্ষিকীর কর্মসূচী এই সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৫০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

রোকশানা বেগম
সেক্রেটারী ইশায়াত

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতে মাতাপিতা দিবস উদযাপন

গত ২৭শে জুলাই ২০০৭ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর উদ্দ্যোগে মাতা-পিতা দিবসের আয়োজন করা হয় এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে তা উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ চৌধুরী। এ ছাড়াও এই দিবসে উপস্থিত থাকেন বৃহত্তর সিলেট জেলার জেলা কায়েদ এবং স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব সোহেল আহমদ চৌধুরী।

সোহেল আহমদ চৌধুরী
জেনারেল সেক্রেটারী

ক্রোড়া, বিষ্ণুপুর, আখাউড়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্-র সম্মিলিত বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন

গত ২৬, ২৭ জুলাই ০৭ ক্রোড়া, বিষ্ণুপুর, আখাউড়া মজলিসের সমন্বয়ে ক্রোড়াতে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমার উদ্বোধনী সভায় জনাব হালিম আহমদ হাজারি কায়েদ তাহরীকে জাদীদ ও সদর সাহেবের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে সহঃ রিজিঃ নাযেম মোশাররফ হোসেন, জেলা নাযেম জনাব সালাউদ্দিন আহমদ ও জনাব আছাদুজ্জামান ভূইয়া প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া ও আগত আনসার ভাইদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আগত ৩টি মজলিসের জয়ীমগণ বিগত ৬ মাসের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন এবং ওয়াদা করেন যে, আগামী ৬ মাসের মজলিসি সকল কর্মকান্ড সাধ্য মতন বাস্তবায়ন করবেন। জনাব হালিম আহমদ হাজারি কায়েদ তাহরীকে জাদীদ ও সদর সাহেব এর প্রতিনিধির সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণের পর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শফিউল আলম বরকত
রিজিওনাল কায়েদ

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৩৫তম বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ১২ ও ১৩ জুলাই ২০০৭ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে ৩৫তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন মিসেস আমাতুল কাইয়ুম (নায়েব সদর)। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আব্দুল মতিন মুরব্বী সিলসিলাহ। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কুইজ ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ১৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন স্থানীয় আমীর সাহেব জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী।

রোকশানা বেগম
সেক্রেটারী ইশায়াত

খুলনা লাজনা ইমাইল্লাহ্-র তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

০৬-০৮-২০০৭ তারিখ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্দ্যোগে খুলনার বানরগাতিতে এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মোহতারীমা দীনা নাসরিন

মোফাত্তিস খুলনা অঞ্চল এর সভানেত্রীত্বে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খাতামান্নাবীঈন (সাঃ), ওফাতে ঈসা (আঃ) এবং সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই তিন বিষয়ের উপর ১ ঘন্টা যাবত আলোচনা করেন মোফাত্তিস সাহেবা। এরপর সকল বিষয়ের উপর গয়ের আহমদী বোনেরা প্রশ্ন করেন। সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোফাত্তিস সাহেবা। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্তানের তরবিয়তের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২২ জন আহমদী এবং ১৫ জন অ-আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কোরায়েশা মাজেদ
জেনারেল সেক্রেটারী লাজনা ইমাইল্লাহ্
খুলনা

কুমিল্লা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩ ও ৪ আগষ্ট কুমিল্লা জেলার স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে জনাব হালিম আহমদ হাজারী কেন্দ্রীয় কায়েদ, জেলা নাযেম, রিজিওনাল প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং উপস্থিত আনসার ভাইদের নিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়। উক্ত ইজতেমায় উপস্থিত সংখ্যা আনসার ২২ জন কেন্দ্রীয় ২ জন রিজিওন ২ জন জেলা ১ জন খাদেম ৬ জন সর্বমোট উপস্থিতি সংখ্যা ৩৩ জন। সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ও শেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শফিউল আলম বরকত
রিজিওনাল নাযেম

সুন্দরবন জামাতের ৫ম বার্ষিক কর্মশালা–২০০৭ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন এর বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী গত ১৩ আগষ্ট ২০০৭ রোজ সোমবার এক দিনের কর্মশালা বায়তুস্ সালাম মসজিদে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ১০টায় মোহতরম আমীর জনাব আব্দুল মজিদ সরদার সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুপুর ১.০০টা থেকে ২.০০টা পর্যন্ত গোসল, নামায ও খাওয়ার বিরতি ছিল। ২.৩০ থেকে পুনরায় শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শেষ হয়। উক্ত কর্মশালায় মজলিসে আমেলা সুন্দরবনের ১১ জন সদস্য এবং সুন্দরবন জামাতের ১৬টি হালকার মধ্যে ১৩টি হালকা ও নিকটস্থ ঘরিলাল জামাতের প্রতিনিধি নিয়ে মোট ২৬ জন হালকার আমেলার সদস্য, ২ জন মুরব্বী সিলসিলাহ ও ৭ জন দেহাতী মোয়াল্লেম উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে সমাপ্তি অধিবেশনে মোহতরম আমীর সাহেব কর্মশালার এই শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে নিজ নিজ হালকায় কাজ করার জন্য আহ্বান করেন এবং সংক্ষিপ্তাকারে নসিহত মূলক বক্তব্য পেশ করেন।

এস, এম রেজাউল করীম
জেনারেল সেক্রেটারী

আনসারুল্লাহ্‌র বৃহত্তর সিলেট জেলার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ও ২৮ জুলাই ০৭ বাদ জুমআ ৭টি মজলিস সমন্বয়ে পাগুলিয়া (মৌলভীবাজার)-তে ইজতেমার কাজ সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। মজলিস সমুহ হচ্ছে ঃ ১) সিলেট সদর ২) হবীগঞ্জ ৩) ইসলামগঞ্জ ৪) বড়চর ৫) চানপুর চা বাগান ৬) জামালপুর ৭) পাগুলিয়া। উপস্থিত আনসার ১৪ জন এবং কেন্দ্র থেকে মোহতরম সদর, কায়েদ তাজনীদ ও জনাব হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব, রিজিওনাল মজলিস থেকে রিজিওনাল নাযেম ও নায়েব নাযেম তালিমুল কুরআন যোগাদান করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্। উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্তির পর সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান চলে। সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিউল আলম বরকত, রিজিওনাল নাযেম।

শফিউল আলম বরকত
রিজিওনাল কায়েদ

শার্শার বেতনা নদীর উপর বাঁশের সাঁকো নির্মাণ

গত ২৩ জুলাই শার্শা উপজেলার উলাশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রীর স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুল সংলগ্ন বেতনা নদীর উপর দিয়ে দুই শত গজ দীর্ঘ বাঁশের সাঁকো স্থাপন করা হয়েছে। নবনির্মিত এ বাঁশের সাঁকো আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয়। এর উদ্বোধন করেন রঘুনাথপুর বাগ আহমদীয়া মসজিদের পেশ ইমাম মোয়াল্লেম শাহ আলম খান।

এ সময়ে উলাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সাংবাদিক ও মসজিদের মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। জনকল্যাণকর এ কাজের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড মেম্বার মহোদয় আহমদীয়া জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা প্রদান করেন। যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক গ্রামের কাগজ পত্রিকায় ২৪ জুলাই ২০০৭ তারিখে এ সংবাদ পরিবেশিত হয়।

শাহ্ আলম খান, মোয়াল্লেম ও
প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)

লন্ডন জলসা উপলক্ষ্যে সৈয়দপুর জামাতে গৃহীত কার্যক্রমে ৬ জন ভ্রাতার বয়াত গ্রহণ

লন্ডন জলসা ২০০৭ উপলক্ষ্যে সৈয়দপুর জামাতে গৃহীত সকল প্রোগ্রাম মোটা মুটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জলসার প্রোগ্রাম দেখানোর জন্য স্থানীয় জামাতে গৃহীত সকল কর্মসূচী সার্বিক ভাবে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সুম্মা আল্হামদু লিল্লাহ্।

বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনগুলোতে উপস্থিত হওয়াটা কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপস্থিত জেরে তবলিগগণের মধ্যে থেকে ৬ জন বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

জলসার তিনদিন ফজর ও যোহর নামাযের পর তালিমি ক্লাস অনষ্ঠিত হয়। মৌঃ রবিউল ইসলাম মুরব্বী সিলসিলা ও মৌঃ আব্দুস সালাম মোয়াল্লেম ভাতগাঁও, তালিমী ক্লাসের দায়িত্ব পালন করেন।

জলসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মাগরিবের নামাযের পর থেকে জলসার প্রোগ্রাম শুরুর পূর্ব পর্যন্ত জেরে তবলীগ ভাইদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
জেনারেল সেক্রেটারী

শুভ বিবাহ

গত ০২/০২/০৭ ইং মোসাঃ শাহরীনা সুলতানা (কারিন) পিতা-মৃত বাহার উদ্দিন, সরকার পাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে এ, বি, এম আহসান, পিতা এ, বি, এম আইউব, ৮৩৬, মিয়া সরনী রোড, পশ্চিম পলাশপুর এর বিয়ে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৩/০৭

গত ২২/০৯/০৬ইং মোসাঃ শামিম সুলতানা পিতা-মোহাম্মদ হুমায়ুন লস্কর, কলেজপাড়া বি, বাড়ীয়া এর সাথে মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান ভুঞা বিষ্ণুপুর, বি, বাড়ীয়া এর বিয়ে ১,০০০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৪/০৭

গত ০৯/০২/০৭ইং মোসাঃ উম্মে রাবেয়া (রিপা) পিতা-গোলাম আহমদ কাজল এর সাথে মোহাম্মদ নিয়ামত উদ্দিন মস্তান পিতা-মোহাম্মদ শরীফ আহমদ মস্তান ১১১১, পশ্চিম নন্দিপাড়া মাদারটেক এর বিয়ে ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৫/০৭

গত ৩১/০১/০৭ ইং মোসাঃ মালিহা রাহ-নুমা পিতা মোবাশশের উর রহমান, বাসুদেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে জুলওয়াকার মোহাম্মদ আল কবির, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ১/এ/১ শ্যামলী, রিং রোড, মোহম্মদপুর এর বিয়ে ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৬/০৭

গত ০১/০৩/০৭ ইং মোসাঃ শাবনুম মুস্তারী (সুমী) পিতা-শাহ মকছুদুর রহমান, ১২-বি,৬/১০৬ পল্লবী, মিরপুর ঢাকা-১২১৬ এর সাথে জনাব কবির আহমদ পিতা-মোহাম্মদ মনিরুল হক ১২-বি, ৫/১০৬ পল্লবী, মিরপুর ঢাকা এর বিয়ে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৭/০৭

গত ১১/০৩/০৭ ইং মোসাঃ তানজিনা আক্তার (রূপালী) পিতা-মোহাম্মদ হানিফ ফকির, ফকিরপাড়া, পোষ্ট ছোনটিয়া বাজার জেলা জামালপুর এর সাথে সৈয়দ রাজন আহমদ পিতা মরহুম জালালউদ্দিন তারুয়া বি,বাড়ীয়া এর বিয়ে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৮/০৭

গত ০৮/০২/০৭ ইং মোসাঃ রুমী আক্তার পিতা-মরহুম নূরুল হুসেন গ্রাম+পোষ্ট থানা বাগবাড়ী জেলা বগুড়া, এর সাথে মোস্তাফিজুর রহমান পিতা ডাঃ মোখলেছুর রহমান গ্রাম–পোষ্ট কালাঘড়া থানা নবীনগর জেলা বি, বাড়ীয়া এর বিয়ে ৫০,১০১/- (পঞ্চাশ হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩৯/০৭

গত ২০/০২/০৭ ইং হামিদা বেগম সাথী পিতা-কবির আহমদ, মৌড়াইল নগরবাড়ী, এর সাথে নাছির আহমদ পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব, তালশহর, বি, বাড়ীয়া এর বিয়ে ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৪০/০৭

গত ২১/০২/০৭ ইং মোসাঃ শাহনাজ আক্তার পিতা-আব্দুল মালেক লস্কর মাহিগঞ্জ টেক্সদিঘীরপাড়, জেলা রংপুর এর সাথে জনাব সুমন আহমদ পিতা-মরহুম জিল্লু মিয়া মৌড়াইল বি, বাড়ীয়া এর বিয়ে পঁচাত্তর হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৪১/০৭

গত ০২/০৩/০৭ ইং মোসাঃ রুবিনা আক্তার পিতা-মোহাম্মদ রমজান আলী শালশিড়ী, সোনাচান্দী, ফুলতলা, জেলা পঞ্চগড় এর সাথে জনাব রবিউল ইসলাম পিতা-ফালু মিয়া, শালশিড়ী, ফুলতলা বাজার, জেলা পঞ্চগড় এর বিয়ে ১৮,৯৯৯/- (আঠার হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৪২/০৭

গত ০৬/০৩/০৭ ইং মোসাঃ মোস্তাকিমা বেগম পিতা-মোহাম্মদ মতিউর রহমান শালশিড়ী ফুলতলা পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ সিদ্দিক আলম পিতা-মরহুম সামসুজ্জামান শালশিড়ী ফুলতলা বাজার পঞ্চগড় এর বিয়ে ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৪৩/০৭

গত ১৭/০৩/০৭ ইং মোসাঃ লতিফা খাতুন পিতা-জনাব আব্দুল মালেক শালশিড়ী ফুলতলা পঞ্চগড় এর সাথে জনাব সুলতান আহমদ পিতা-মোয়াজ্জেম হোসেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বকশী বাজার ঢাকা এর বিয়ে ১৯,৯৯৯/- (উনিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৪৪/০৭

গত ১৯/০৩/০৭ ইং মোসাঃ রাশিদা আক্তার পিতা-মোহাম্মদ আরব আলী ভুঞা বলিয়ারকান্দি, আড়াই হাজার নারায়ণগঞ্জ, এর সাথে এস আব্দুল্লাহ্ আক্তার পিতা-এস, এম, ওয়ারিদ আলী গ্রাম মুরঙ্গল থানা তাড়াইল জেলা কিশোরগঞ্জ এর বিয়ে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৪৫/০৭

গত ০২/০২/০৭ ইং মোসাঃ রওশন আরা বেগম পিতা-শাহ আলম ভুঞা গ্রাম বাহাদুরিয়া, পোষ্ট কুঠিরহাদ, থানা সোনাগাজী, জেলা ফেনী এর সাথে ময়নুল ইসলাম ভুঞা পিতা-মরহুম মফিজুল ইসলাম ভুঞা গ্রাম পোঃ বাসুদেব জেলা বি, বাড়ীয়া এর বিয়ে ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৪৬/০৭

গত ০৫/০৪/০৭ ইং সাবিনা ইয়াসমিন (ইতি) পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ উদ্যমপুর, হেমনগর, থানা গোপালপুর, জেলা টাঙ্গাইল এর সাথে মোহাম্মদ আল মাহমুদ পিতা মরহুম আশরাফউদ্দিন ভায়াডাঙ্গা শেরপুর এর বিয়ে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৪৭/০৭

শোক সংবাদ

(১) অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৮-৮-২০০৭ সকাল ৯.৪৫ মিঃ আমার মা নূর জাহান বেগম ব্রেন ষ্ট্রোক করে সিভিল সার্জন মুন্সিগঞ্জ এর চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় নিজ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। তিনি মুন্সীগঞ্জ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম মৌঃ মোহর আলী সাহেবের স্ত্রী। তিনি নিজেও উক্ত জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জামাতের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে, বহু নাতী নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তাআআলা যেন তাঁর আত্মাকে মাগফিরাতের ও রহমতের চাঁদরে আবৃত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চাসনে স্থান দান করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন এজন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

কামাল পাশা, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা

(২) গত ২১/০৭/২০০৭ রাজশাহী জামাতের সৈয়দপুর বাগমারা হালকার বাশৈল নিবাসী আবুল কালাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। তিনি সদালাপী সহজ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ও ২ মেয়ে, স্ত্রী ও বহু গুণগ্রাহী রাখিয়া যান। মৃত্যুর পর তার মরদেহ বাসযোগে দেশের বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৬ বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে এই কার্যগুলি সম্পন্ন হয়। আমরা তাহার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সাবরে জামিল দান করার জন্য খাস ভাবে দোয়ার আবেদন করিতেছি।

মোহাম্মদ আবুল হোসেন, প্রেসিডেন্ট

সন্তান লাভ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ২৩/০৭/২০০৭ইং তারিখে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) তার নাম রেখেছেন আনসার আহমদ। হুযূর (আইঃ) তাকে ওয়াকফে নও হিসেবেও সদয় অনুমোদন দান করেছেন। তার দাদা আহমদ নগর জামাতের সদস্য মরহুম বশীর আহমদ ও নানা মৌলভী ইস্রায়িল দেওয়ান অবসর প্রাপ্ত মুয়াল্লেম সাহেব। আমরা তার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কামিয়াবীর জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়াপ্রার্থী।

জাফর আহমদ ও মিসেস মুসলেহা জাফর

একই পুকুরে কই-মাগুর-শিং মাছের সমন্বিত চাষ

শিং, মাগুর ও কই-এ তিনটি মাছই মৎস্যভোজীদের অতি প্রিয়। এ মাছ তিনটি জিওল মাছ নামে অভিহিত। মাছ তিনটির পুষ্টিমান ও স্বাদ যেমন আকর্ষণীয় তেমনি বাজার-মূল্যও চড়া। রোগীদের পথ্য হিসেবে এসব মাছ অনেকে খেয়ে থাকেন। একসময় খাল-বিল ও হাওড়ে এসব মাছ যথেষ্ট পাওয়া যেত, কিন্তু এখন এসব মাছ সহজলভ্য নয়। এমনকি প্রাকৃতিক জলাশয়ে এর বংশ লোপ পাচ্ছে। এ মাছগুলো এখন চাষের মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব। মাছগুলো একক চাষের পাশাপাশি মিশ্র চাষও সম্ভব।

মিশ্র চাষের সুবিধা

জিওল মাছ বিধায় স্বল্প অক্সিজেনে বাঁচতে পারে। মিশ্র চাষে একে অপরের ক্ষতি করে না। এদের খাদ্যের পুষ্টিমান প্রায় এক বলে একই ধরনের খাবারে চাষ করা যায়। প্রায় একই সময় মাছ আহরণ করা যায়।

কীভাবে চাষ করবেন?

মোটামুটি ৩০ থেকে ৫০ শতকের পুকুর এদের চাষের উপযোগী। বন্যামুক্ত এবং পুকুরের মজবুত পাড় থাকা আবশ্যক। পুকুরের পাড়ে নাইলনের জালের বেষ্টনী দেওয়া দরকার।

পুকুরের প্রস্তুতি : প্রথমে পানি শুকিয়ে সব জলজ প্রাণী বা মাছ (থাকলে) তা তুলে নিতে হবে আর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন বা্ ফসটক্সিনের মাধ্যমে সব জলজ জীব মেরে বা তুলে নিতে হবে। আর নতুন পুকুর কাটা হলে এমনভাবে কাটতে হবে, যেন পাড়ের বাহির ও ভেতরের ঢাল যথাক্রমে ২ঃ১ এবং ১ঃ১ হয়। ভেতরের দিকে এক ফুট প্রস্থ বকচর থাকবে। পুরনো পুকুর হলে পাড় ও তলদেশ ভালভাবে সংস্কার করা আবশ্যক। কাঁকড়ার গর্ত বন্ধ না করলে শিং ও মাগুর এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে চলে যেতে পারে। পাড় ও তলদেশ সংস্কারের পর প্রথমে প্রতি শতকে দু'/এক কেজি করে চুন দিতে হবে, দুই দিন পর ৩৫০ গ্রাম জিওলাইট (দানাদার) দেওয়ার পর পানি নিতে হবে, যদি আগের পানি থেকে থাকে তাহলে প্রতি শতকে পাঁচ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি সার একত্রে গুলে তা সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার দেওয়ার চার-পাঁচ দিন পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবার জন্মায়। তখন পোনা ছাড়ার উপযোগী হয়।

পোনা ছাড়া : শিং, মাগুর ও কইয়ের মিশ্র চাষে প্রতি শতকে ১০০ কই, ১০০ শিং ও ৫০টি মাগুর মাছের পোনা মজুদ রাখা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, লাভজনক চাষ এবং ঝুঁকিমুক্ত থাকার জন্য ছোট পোনা সরাসরি না ছেড়ে প্রথমে নার্সারি পুকুরে নার্সিং করার পর শিং ও মাগুর চার ইঞ্চি এবং থাই কই প্রতিটি পাঁচ গ্রাম হিসেবে মজুদ করতে হবে। পোনা অবশ্যই রোগমুক্ত, স্বাস্থ্যবান এবং একই আকারের হওয়া আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে কইয়ের পোনা দিয়ে পরের সপ্তাহে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বড় সাইজের শিং ও মাগুরের পোনা মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্য : মানসম্মত খাদ্য না হলে শিং, মাগুর বা কই চাষ লাভজনক হয় না। ৩৫ শতাংশ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার জিওল মাছের উপযোগী। এদের খাবারে প্রাণিজ প্রোটিন বেশি হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া খাবারের সঙ্গে এনজাইম, গ্রোথ প্রোমোটর ও ভিটামিন প্রি-মিক্স পরিমাণমতো প্রয়োগ করতে হবে। মাছের গড় ওজনের ওপর ভিত্তি করে ১৫ থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। দৈনিক তিন বার খাবার দেওয়া উচিত।

অন্য ব্যবস্থাপনা : জিওল মাছ চাষকালীন রাসায়নিক সারের প্রয়োজন নেই, তবে পুকুরে দুদিকে পানিতে এবং শুকনায় এমনভাবে কিছু গোবর দেওয়া উচিত, যাতে গোবরের কিছু অংশ পানিতে এবং কিছু অংশ পানিসংলগ্ন শুকনায় থাকে। প্রতি মাসে একবার ২০০ গ্রাম জিওলাইট প্রতি শতকে দিতে হবে অথবা প্রতি ৪০ দিনে একবার 'অ্যাকোয়া ম্যাজিক' (জিওলাইট+প্রোবায়োটিক) প্রয়োগ করলে পুকুরের তলদেশ স্বাস্থ্যকর থাকবে। পানিতে অধিক শ্যাওলা বা ফাইটোপ্লাংটনের ব্লুম হলে তা দূরীকরণে পরিমিত মাত্রায় 'সি-উইড' বা 'আলজিগো' প্রয়োগ করা উচিত। কোনো কারণে পানি নষ্ট হলে বা দুর্গন্ধযুক্ত হলে তা পরিবর্তনে সুফল পাওয়া সম্ভব। অনেক সময় কই মাছে ক্ষত হয় বা আঁইশ উঠে যায়, এ অবস্থায় প্রথমে প্রতি শতাংশে এক কেজি হারে খাদ্য লবণ প্রয়োগে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মাছে ক্ষত বা লালচে ফোসকার মতো দেখা গেলে পুকুরের তলদেশের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যদি অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় , তাহলে 'গ্যামোনেক্স ব্যবহারে মুক্তি পাওয়া যায়। মাছে ক্ষতরোগ দেখা দিলে প্রতি কেজি খাবারের সঙ্গে দুই-তিন গ্রাম রেনামাইসিন এবং দুইগ্রাম ভিটামিন সি প্রয়োগ করা উচিত।

মাছ আহরণ : সাধারণত ১২০ দিন পর কই মাছ আহরণ করা যায়। এ সময়ে এগুলো প্রায় ১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। তবে শিং ও মাগুর এ সময় না তুলে আরও দেড় মাস পর আহরণ করলে ভালো ওজন পাওয়া যায়। তবে মাগুর ও শিং পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চির মজুদ করলে একই সঙ্গে প্রথমে জাল টেনে এবং পানি সেচে সব মাছ ধরা যায়। এ সময় শিং প্রতিটি ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম এবং মাগুর ৬০ থেকে ৭০ গ্রাম হতে পারে।

(উপস্থাপনায় জিরাআত বিভাগ)

ভাদ্র মাসের কৃষি

সুপ্রিয় পাঠক

সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ভাদ্র মাসের কৃষিকাজ। শুরুতেই ধান চাষ।

ধান

আমন ধান ক্ষেতের অন্তবর্তীকালীন যত্ন নিতে হবে এখন। ক্ষেতে আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করুন। আগাছা পরিষ্কার করার পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। আমন ধানের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২০০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয়। এ সার তিন ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পর, দ্বিতীয় ভাগ ৩০-৪০ দিন পর এবং তৃতীয় ভাগ ৫০-৬০ দিন পর প্রয়োগ করুন। নিচু জমি থেকে পানি নামতে দেরি হয়। পানি নেমে গেলে এসব জমিতে ভাদ্র মাসে আমন ধান রোপন করা যায়। দেরিতে রোপনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, বিনাশাইল বা স্থানীয় উন্নত শাইল ধান বেশ উপযোগী। এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ১৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩০ কেজি টিএসপি এবং ৬০ কেজি এমওপি সার লাগে। ইউরিয়া ছাড়া অন্য দুটি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া তিন ভাগ করে তিন বারে উপরি প্রয়োগ করুন। চারা রোপনের ১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং ৪৫ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার দিন। দেরিতে চারা রোপনের ক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫০৭টি চারা দিয়ে ঘন করে রোপন করতে হয়। আমন মৌসুমে মাজরা পামরি, চুঙ্গি, গলমাছি পোকার আক্রমণ হয়। তাছাড়া খোলপড়া, পাতায় দাগ রোগ দেখা দেয়। নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন। তাছাড়া সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায় শেষ কৌশল হিসেবে স্প্রে করুন।

আখের পরিচর্যা

এই সময় ফসলে লালপচা রোগ দেখা দিতে পারে। এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। লালপচা রোগের আক্রমণ হলে আখের কান্ড পচে যায় এবং পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। এজন্য আক্রান্ত আখ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং জমিতে যাতে পানি না জামে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এ রোগ পানির মাধ্যমে ছড়ায়। তাছাড়া রোগমুক্ত বীজ বা শোধন করা বীজ ব্যবহার করলে অথবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত চাষ করলে লাল পচা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। লালপচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি আখের জাত হচ্ছে ইশ্বরদী-১৬, ইশ্বরদী-২০, ইশ্বরদী-২১।

তুলা চাষ

ভাদ্র মাসের প্রথমদিকেই তুলার বীজ বপন শেষ করতে হবে। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জমিতে 'জো' অবস্থায় ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করুন। এরপর ডিবলিং পদ্ধতিতে বীজ বপন করুন। প্রতি হেক্টর জমিতে বীজের প্রয়োজন হয় ১২-১৫ কেজি। বীজ বপনের সময় এক লাইন থেকে আরেক লাইনের দুরত্ব ৬০-৯০ সেমি. এবং বীজ থেকে বীজের দুরত্ব ৩০-৪০ সেমি. হওয়া উচিত।

শাকসবজি

ভাদ্র মাসে লাউ ও শিমের বীজ বপন করা যায়। এজন্য ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৭৫ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সেমি. গভীর করে মাদা বা গর্ত করতে হবে। এরপর প্রতি মাদায় ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। মাদা তৈরী হলে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনে দিতে হবে এবং চারা গজানোর ২-৩ সপ্তাহ পর দু-তিন কিস্তিতে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫ গ্রাম এমওপি সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। শীমের বীজ বপন করতে পারেন এ সময়।

সবজি চারা উৎপাদন

এ সময় থেকে আগাম শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন কাজ শুরু করা যায়। সবজির চারা উৎপাদনের জন্য উঁচু এবং আলোবাতাস লাগে এমন জায়গা নির্বাচন করুন। জমি ভালভাবে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন। চাষের সময় এক বর্গমিটার জমির জন্য ১০ কেজি জৈব সার এবং ৩০০ গ্রাম টিএসপি মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিন। জমি তৈরী হয়ে গেলে এক মিটার চওড়া করে এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে বেড তৈরী করুন। দু'টি বেডের মাঝখানে ৬০ সেন্টি মিটার ফাঁকা রাখতে হবে। এ ফাঁকা স্থানের মাটি কোদাল দিয়ে দু'বেডে উঠিয়ে দিন। এতে যে নালা তৈরী হবে তার গভীরতা হতে হবে ১৫ সেন্টিমিটার। বীজতলা তৈরী হয়ে গেলে বীজ বপন করুন। মাটির এক থেকে দেড় সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ফুলকপির বীজ ৪০-৪৫ গ্রাম, বাঁধাকপির বীজ ৫০-৬০ গ্রাম, বেগুনের বীজ ৮০-১০০ গ্রাম, টমেটোর বীজ ৮০-১০০ গ্রাম লাগবে। বীজ বোনার পর বেডগুলো চাটাই বা পলিশিটের ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখুন। চারা গজানোর পর সকালে এবং বিকালে হালকা রোদ লাগার ব্যবস্থা করুন। কড়া রোদ যাতে না লাগে সেজন্য বেডগুলো ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। চারার শিকড় শক্ত হলে এবং আসল পাতা মেলতে শুরু করলে রোদ বেশ উপকারী। চারা গজানোর আগে এবং পরে বৃষ্টি থেকে চারা রক্ষা করতে হবে। এজন্য পলিথিনের ছাউনি বেশ কার্যকর। চারা একটু বড় হলে ইউরিয়া এবং এমওপি সার দেয়া যেতে পারে তবে এ সার দুটো মাটিতে না দিয়ে সেচের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া ভালো। এ জন্য প্রতি লিটার পানিতে সার দুটোর ১-২ গ্রাম করে গুলে ঝাঁজরি দিয়ে ভিজিয়ে দিন। বীজতলায় চারা ঘন হয়ে গেলে কিছুটা পাতলা করে দিন। এরপর

রোপনের উপযুক্ত হলে দেরি না করে সবজির চারা রোপন করুন। সাধারণত সবজির চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে রোপণের উপযোগী হয়।

গাছপালা

ভাদ্র মাসেও ফলবৃক্ষ এবং ওষুধি গাছের চারা রোপণ করা যায়। আর এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেঁটে দেয়া, বেড়া/খাঁচা এবং খুঁটি দেয়া, মরা চারা তুলে নূতন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করুন নিয়মিত। ভাদ্র মাসে আম, কাঁঠাল, লিচু গাছ ছেঁটে দিতে হয়। ফলের বোঁটা, গাছের ছোট ডালপালা, রোগাক্রান্ত অংশ ছেঁটে দিলে পরের মৌসুমে বেশি করে ফল ধরে। এতে ফলগাছে রোগও কম হয়।

পশু সম্পদ

গো-খাদ্যের জন্য রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়ে বা পতিত জায়গায় খেসারি, মুগ, মাসকলাই, ভুট্টার বীজ বুনতে পারেন। বর্ষায় গোয়াল ঘর, হাঁস-মুরগীর ঘরের ক্ষতি হয়ে থাকলে তা সংস্কার করুন। গবাদি পশুর রোগবালাই সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। এ সময় হাঁসমুরগির বাচ্চা ফুটাতে পারেন। পশুপাখি পালনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন, নিয়মিত টিকা প্রদান করুন এবং সুষম খবার পরিবেশন করুন।

মাছ

বর্ষায় ক্ষতি হওয়া পুকুর পাড় মেরামত করুন এবং পুকুর পাড়ে আম্রপালি, ডালিম, লেবু, করমচা, পেয়ারা, জামরুল জাতীয় ফলের গাছ লাগাতে পারেন। পুকুরে নতুন মাছ ছাড়ারও সময় এখন। মাছ ছাড়ার আগে পুকুরের জলজ আগাছা পরিষ্কার করে নিন। যেসব পুকুরে মাছ আছে সেসব পুকুরে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। তাছাড়া নিয়মিত মাছের খাবার দিন। রোগের আক্রমণ থেকে মাছকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

প্রিয় পাঠক,

কৃষি বিষয়ক যেকোনো পরামর্শ নিতে আপনার নিকটস্থ কৃষিকর্মী বা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে কথা বলুন। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।

[কৃষিকথা ঃ শ্রাবণ ১৪১৪ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

–উপস্থাপনায় জিরাআত বিভাগ]

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

(১) ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দক্ষিণ মৌড়াইল হালকার জনাব কামরুল হোসেন ও জনাবা শিরীন খানমের প্রথমা কন্যা ফাতেমা বেগম (নীলা) ২০০৭ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সাবেরা সোবহান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে G.P.A- 5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে সে ২০০৪ সালে অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তিলাভ করেছিল।

কামরুল হাসান পাটওয়ারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(২) আমার বড় মেয়ে মমতাজ বেগম (সাথী) ২০০৭ইং সালের MBBS ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে কৃতকার্য হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্! সে যাতে Medical Science -এ আরও উচ্চতর ডিগ্রিগুলো কৃতিত্বের সাথে অর্জন করে চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা সমাজের এবং জামাতের খেদমত করার সুযোগ পায় সে জন্য জামাতের সকল ভ্রাতাভগ্নির কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

আব্দুল কাদির, জেনারেল সেক্রেটারী, ফতুল্লা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক আহমদী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র। এ পত্রিকা ধর্মীয় জ্ঞান অনুরাগীদের চাহিদা পূরণ করে।

এটি পবিত্র কুরআন হাদীস ও সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এর লিখনীতে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভান্ডার। এতে প্রকাশিত যুগ খলীফা প্রদত্ত জুমআর খুতবা ও সময়োপযোগী নানা বিধ তাহরিক সবাইকে সর্বক্ষণ পথ নির্দেশ করে।

সুপ্রিয় পাঠক! কালের চাহিদা পূরণকারী তথ্যাবলীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে আপনি এর গ্রাহক হয়েছেন কি? না হয়ে থাকলে অবিলম্বে এর গ্রাহক হোন।

এর গ্রাহক চাঁদা ডাক মাশুল সহ বার্ষিক–
(ক) ১৫০/- একশত পঞ্চাশ টাকা (বাংলাদেশ)
(খ) ৩০০/- তিনশত টাকা (ভারত)
(গ) ইউ. এস. ১০০ ডলার (অন্যান্য দেশে)

New Method অনুযায়ী English কোচিং দেয়া হয়।

শ্রেণী ঃ ৭ম থেকে ১২শ পর্যন্ত।

শিক্ষক ঃ মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন

বি. এ (অনার্স) এম এ। প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক।

বগুড়া ক্যান্ট, পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া।

মোবাইল নং- ০১১৯৯১০৪১৬০

০১৭২৫০৯০৩২৫ বাসা ঃ

গ্লোব নিবাস

ফ্লাট নং- বি (দ্বিতীয় তলা)

বিল্ডিং নং-১

৫৬/৫৭ হোসেনী দালান রোড, বকশীবাজার, ঢাকা

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing). শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

New Vol. No. 70 ■ 4th Issue
Fortnightly

The AHMADI

31 August, 2007. ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

সালানা জলসা ২০০৭, বেলজিয়াম

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: amgb@bol-online.com